উত্তরের
উন্নয়ন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ • সংখ্যা-২৬ • বর্ষ-৬

প্রত্যয়
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ • সংখ্যা-২৬ • বর্ষ-৬

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ইনফ্রা-রেড কমিউনিকেশনস লি.

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

প্রোডাকশন
মেসার্স অঞ্জলি.কম

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

সম্পাদকীয়

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ▮ ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকেই মাঝারি শিল্পের যাত্রা

অমিত সম্ভাবনার বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। এর পেছনে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সরবরাহসহ বিভিন্ন অবকাঠামো খাতে উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তেমনি দেশের বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদানও ব্যাপক। স্বাধীনতার পর দেশে অনাহারে জর্জরিত দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষদের ক্ষুধামুক্তির লক্ষ্যেই এনজিওদের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর আসে পুনর্বাসনের প্রশ্ন। এভাবেই ক্রমাগত এনজিও সেক্টরের নানামুখী কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এনজিওরা যখন উপলব্ধি করতে পারলো যে শুধুমাত্র দারিদ্র্য নিরসন হলেই হবে না, এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে উন্নয়ন তা স্থায়ী করতে হবে। তখন এনজিও/এমএফআইসমূহ দরিদ্র ও হতদরিদ্রসহ প্রান্তিক আয়ের মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ এসব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে শুরুতে ২ থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে তা কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন নিজেদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তেমনি তাদের অনেকেই এখন ৫/১০ লাখ টাকা এমনকি আরো বেশি পরিমাণ ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকেই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে এসএমই ও মাঝারি শিল্প। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন কর্মসংস্থান।

এই প্রক্রিয়াতেই বর্তমানে দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকার অধিক হয়েছে। এই অর্থায়নের এক বিপুল অংশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পসহ হাঁস-মুরগী, গরুর খামার, মৎস চাষ, গ্রোসারি শপ, ইজি বাইক ক্রয়সহ নানা আয়বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগ হয়েছে। অনেকে সবজি চাষেও বিনিয়োগ করেছেন। এনজিও/এমএফআইদের ক্ষুদ্রঋণে ইতোমধ্যে প্রায় ৩ কোটি মানুষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। এতে করে অন্তত ৪/৫ কোটি মানুষের আত্মকর্মসংস্থানসহ বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এমনও দেখা যায় যাদের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া চলার কোনো অবস্থাই ছিল না, তারাও এই ক্ষুদ্র অর্থায়নের দ্বারা নিজেরাই অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছেন। এভাবেই দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে উৎপাদন সম্পৃক্ত উন্নয়নের এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এতে যেমন দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, পাশাপাশি দেশে স্থায়ী উন্নয়নের ভিত পাকাপোক্ত হয়েছে।

আমরা কথায় কথায় বলি প্রতিটি গ্রাম স্বনির্ভর হলেই বাংলাদেশ স্বনির্ভর হবে। তেমনি এটিও সত্য যে, যতো বেশি মানুষ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে ততোটাই দেশের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। এ দেশে সেই কাজটিই সম্ভব করেছে এনজিও খাত। একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যের অর্থ দিয়ে ক্ষুধার জ্বালা মেটায়, কিন্তু এনজিওদের ঋণ তারা কাজে লাগিয়ে আর্থিক উন্নয়নে ব্যবহার করে। বিশ্বব্যাপী স্থায়ী উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যে বর্তমান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা যে এসডিজি অগ্রগতি বিষয়ক সম্মাননা লাভ করেছেন– এক্ষেত্রে এনজিও এবং এমএফআই খাতের অবদান অনেকখানি।

৭৫ এর ১৫ আগস্ট এ জাতির জীবনে এক ভয়ানক কালো দিন। এ দিনটিতে স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। বুরো বাংলাদেশসহ এনজিও খাত বঙ্গবন্ধুর শহীদ হবার এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে স্মরণ করেছে। জাতির জনকের মহাপ্রয়াণ নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ও সকল শাখা ও কার্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আমরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদদের মাগফেরাত কামনা করছি।

প্রত্যয় এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও উপদেষ্টা সম্পাদক এফএনবি চেয়ার ও বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন এর প্রত্যাশা– 'প্রত্যয়' হবে এনজিও-এমএফআই খাতের সর্বজনীন মুখপত্র। তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এনজিও-এমএফআইদের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রত্যয়ে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরার নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশের আলোকে ইতোমধ্যে প্রত্যয় টিম রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও সিলেট অঞ্চলে সরেজমিন গিয়ে এ সংখ্যায় বেশ কিছু প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে। পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে অন্যান্য জেলার ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থা ও তাদের দ্বারা পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চিত্রও ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার প্রত্যাশা করছি।

বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তা নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঙ্গনের প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মননশীল ও জ্ঞানগর্ভ ধারণাকে আমরা গুরুত্ব প্রদান করি। তারই আলোকে প্রত্যয়কে এবার সাক্ষাৎকার দিয়েছেন– সাবেক আইজিপি ও রাষ্ট্রদূত **হাসান মাহমুদ খন্দকার** ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর মহাপরিচালক **কে. এম. তারিকুল ইসলাম**

দেশের নানা প্রান্তের অসংখ্য এনজিও/এমএফআই দারিদ্র্য নিরসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রচেষ্টা তুলে ধরতে রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও সিলেট অঞ্চলের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিদের সাথে সরাসরি কতা বলেছে প্রত্যয় টিম। একই সাথে এই অঞ্চলগুলোর একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকারও এই সংখ্যায় তুলে ধরা হয়েছে।

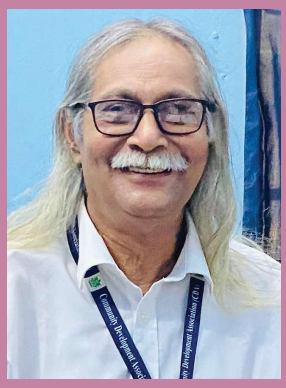

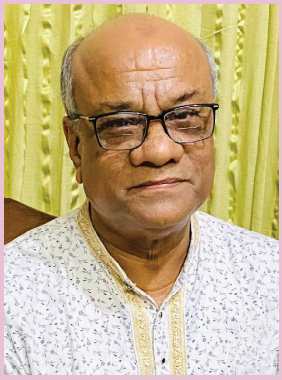

প্রত্যয়কে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন–

ইএসডিও এর নির্বাহী পরিচালক **ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান**
সিডিএ এর নির্বাহী পরিচালক **শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্**
আলোহা'র নির্বাহী পরিচালক **মিনারা বেগম**
বীর মুক্তিযোদ্ধা **মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু**
শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব **অধ্যাপক মনোতোষ দে** এবং
এসএসকেএস এর জেনারেল সেক্রেটারি অ্যান্ড চিফ এক্সিকিউটিভ রোটারিয়ান **বেলাল আহমেদ**।

এছাড়া রংপুরভিত্তিক এনজিও **আরডিআরএস** এর কিছু উন্নয়ন কার্যক্রমের চিত্রও উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করেছেন
প্রত্যয় সম্পাদক **ফেরদৌস সালাম** ও নির্বাহী সম্পাদক **বিদ্যুত খোশনবীশ**

ক্ষুদ্র অর্থায়ন | প্রান্তিক পর্যায়ে বাড়ছে নারীর ক্ষমতায়ন

ফেরদৌস সালাম

মানুষের সোজা হয়ে, সবল হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে 'অর্থ' একটি বড় ব্যাপার। সব কিছুই আছে কিন্তু অর্থসম্পদ নেই– অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে মানুষ মেরুদণ্ডহীন। একজন শক্তিমান সবল পুরুষও অর্থ-সম্পদহীন হলে তাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হতে হয় নতজানু। আর অর্থহীন পুরুষেরই যে দূরাবস্থা সেখানে অর্থবিত্তহীন নারীর অবস্থা কতো শোচনীয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। তিন দশক আগেও এ দেশের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ নারী বিশেষ করে গ্রামীণ নারী সমাজ ছিলেন লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও গঞ্জনার শিকার। এর মূল কারণ ছিল সে সময় হাতে গোনা দু'চারজন ছাড়া প্রায় সকল নারীই ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক কর্মবঞ্চিত। যদিও এই নারী সমাজ– গৃহের সকল কাজ-কর্ম, এমনকি স্বামীর অর্থনৈতিক কার্যক্রম যেমন ধানের আঁটি বাড়িতে আনার পর মলন দেয়া, ধান শুকানো, ধান সিদ্ধ করা, চাল ভানা, খড় নাড়া ইত্যাদি সকল কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও তাদের কাজের কোনো অর্থনৈতিক মূল্য ধরা হতো না। অর্থাৎ অর্থনীতির মূল ধারায় তাদের শ্রমমূল্য গণ্য করা হতো না।

শুধু তখন কেনো, এখানেও গ্রামীণ নারীদের গৃহকর্মসহ এসব কাজের কোনো আর্থিক মূল্য ধরা হয় না। স্বাভাবিকভাবে পারিবারিক অবস্থা ভালো ও সহায় সম্পদের মধ্যেও এসব নারীরা ক্ষমতাবঞ্চিত। তাদের নিজস্ব কেনাকাটা ও চাহিদা পূরণের সুযোগ নেই। যে কোনো কিছু ক্রয়ে কিংবা সংসারের কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তারা থাকেন উপেক্ষিত, নির্ভরশীল এবং নতজানু। আমাদের আদি সমাজ ব্যবস্থার এই প্রথার অনেকটাই এখন পরিবর্তন ঘটেছে। আর এই পরিবর্তনের মূল নায়ক হচ্ছে 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন'।

এ দেশের ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেকই নারী। সেই নারী সমাজের ৮০% এখনো গ্রামে বাস করেন এবং বলতে গেলে এদের মধ্যেকার ৯০ ভাগই প্রাতিষ্ঠানিক কর্মের বাইরে গৃহকর্মের সাথে সম্পৃক্ত। স্বাভাবিকভাবেই এ দেশে হাতে গোনা শিক্ষিত কর্মজীবী কিছু নারী ব্যতিরেকে পুরো দেশের নারীই ক্ষমতায়নের স্বাদ বঞ্চিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর কেয়ার বাংলাদেশ, ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় নারীরা কর্মে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পান। তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। তারা বুঝতে পারেন, নারীরাও মানুষ। এই সচেতনতা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে আশির দশকে। যখন এসব বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রশিকা, আশা, বুরো বাংলাদেশ, টিএমএসএস, এসএসএসসহ শত শত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রান্তিক পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন শুরু করে।

প্রথমে পশ্চাদপদ নারী সমাজ ঘরের বাইরে এসে সংগঠনভুক্ত হতেই ভয় পেতেন। এই শঙ্কা পরিবার ও বাইরে দু'দিক থেকেই ছিল। অনেক পরিবারের পুরুষরাও বাধা হয়ে দাঁড়ান। তাদের আশঙ্কা ছিল ঘরের বৌ বাইরে গেলে, অর্থ উপার্জনে সম্পৃক্ত হলে স্বামীকে মানতে চাইবে না। আর সমাজপতিদের ভয় ছিল, যে নারী সমাজকে তারা দাবিয়ে রাখতে পারছেন, নিয়ন্ত্রণে রেখে জুলুম করার সুযোগ পাচ্ছেন সেই পথটা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে অনেক পুরুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্র পুরুষরা যখন উপলব্ধি করতে পারলেন, একার আয় দিয়ে অভাব অনটন ও আর্থিক সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না– সেক্ষেত্রে স্ত্রীর মাধ্যমে যদি বাড়তি আয় আসে তবে এই দারিদ্র্যতার রাহু থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। একটা আলোর আভাস দেখতে পেয়ে তারা তাদের স্ত্রীদের সম্মতি দিলেন। শুরু হলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের সাথে দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা।

আরেকটি বিষয়– এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীরা উপলব্ধি করলেন, তাদের আর্থিক সক্ষমতা নেই বলে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি এমনকি নিজের পিতা-মাতাও বিপদে ৫/১০ হাজার টাকা ঋণ দেয় না, সেখানে এনজিওরা সদস্য হলেই তাদেরকে অর্থনৈতিক উদ্যোগে সহায়তা করতে ঋণ দিচ্ছে। এ বিষয়টি তাদের অভিভূত করেছে, তাদের মধ্যে কিছু করার আস্থা এনে দিয়েছে। দেশের এনজিও/এমএফআইসমূহ বলতে গেলে গ্রামীণ দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের নারীদের ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের

সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্থায়ন যে কতো বিশাল অবদান রেখেছে তা নিয়ে বেশি আলোচনা নেই, এমনকি অর্থনীতি বোদ্ধারাও এ ব্যাপারে সে রকম কথা উচ্চারণ করেন না। অবশ্য একথা বলা হচ্ছে না যে এ দেশে গ্রাম পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের পেছনে শুধু ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থা এবং এনজিওরাই ভূমিকা রাখছে– এর পেছনে গার্মেন্টস সেক্টর এবং সরকারের নানা উদ্যোগও ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে দেশে গার্মেন্টস সেক্টরে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করছে যাদের ৮০ ভাগই নারী এবং এই নারীদের শতভাগই গ্রামের দরিদ্র-হতদরিদ্র পরিবারের। শুধু তাই নয়, এরা শিক্ষার দিক থেকে অল্প শিক্ষিত। তবে এক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকা রয়েছে। এই নারীরা কর্মের জন্যে গৃহের বাইরে পা রাখতে পেরেছেন এনজিওদের সৃষ্ট সচেতনতার কারণেই।

আরেকটি বিষয়, গ্রাম পর্যায়ে আজ যে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে এর সাথে কিন্তু গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের নারীরা নেই। এনজিও/এমএফআই থেকে ক্ষুদ্রঋণ তারাই নিয়েছে যারা দরিদ্র এবং হতদরিদ্র পরিবারের নারী। এর কারণও অবশ্য রয়েছে। মূল কারণ হচ্ছে, দেশের এনজিও খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্য নিরসন। সুতরাং যে সকল পরিবার এবং মানুষ দরিদ্র, এনজিওরা তাদের ঘরেই কড়া নেড়েছে। সহায়-সম্বলহীন এসব দরিদ্র মানুষ অনেক দিক থেকেই পিছিয়ে ছিল। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে, সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, সন্তানদের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এমনকি জীবন সম্পর্কে তারা কখনো স্বপ্নও দেখতে চাইতো না। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস এতো প্রবল ছিল যে, সৃষ্টিকর্তাই তাদের দরিদ্র বানিয়েছেন। এই বিশ্বাস তাদের কখনো এগুতে দেয়নি। মানবেতর জীবন থেকে বেরিয়ে আসার সাহস যোগায়নি। তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়ার কথাও ভাবেননি।

এনজিও খাত তাদের কাছাকাছি যাবার পর ধীরে ধীরে তাদের মানসিকতায় পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। তাদের যখন দেখানো হলো যে, আপনার ইচ্ছে আছে কিন্তু অর্থের অভাবে এই কাজটা, এই উদ্যোগটা আপনি নিতে পারছেন না। সমাজের কেউ আপনাকে এই অর্থ দিচ্ছে না। আবার ব্যাংকে গিয়েও আপনি ঋণ পাচ্ছেন না–তখন তারা উপলব্ধি করলো ঠিকই তো, ইচ্ছে আছে টাকা পেলে এই উদ্যোগটা নেয়া যায়। তখন তারা সাহসী হয়ে উঠলো। সেই শুরু। প্রথমে ২/৩ হাজার টাকাও তারা ঋণ নিয়েছে। নিজেরা হাঁস-মুরগী পালন করেছে, সবজি চাষ করেছে। নিজেদের আয় থেকে দায় শোধ অর্থাৎ কিস্তি পরিশোধ করেছে। স্বামীর সাথে সাথে স্ত্রীর আয় তাদের পরিবারের উন্নয়নে বাতি জ্বালিয়েছে। এসব পরিবারের অধিকাংশকেই একবেলা, আধাবেলা না খেয়ে থাকতে হতো। প্রথমে তারা দু'বেলা খাবার সংস্থান করতে পেরে আনন্দিত বোধ করেছে। এরপর মাথা গোঁজার ঠাঁইকে মজবুত করেছে। ছনের ঘর থেকে টিনের চালা, টিনের বেড়া এখন আরো পরিবর্তন ঘটেছে। এখন অনেকে টিনশেড বিল্ডিং করছে।

নিজেরা অর্থাভাবে লেখাপড়া করতে পারেনি, তারা এখন সন্তানদের পড়াচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজের চিকিৎসা না নিয়ে ডাক্তারদের কাছে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনসহ ঘরে আধুনিক আসবাবপত্র যেমন– খাট, আলমিরা, ফ্যান, কেউ কেউ ফ্রিজও কিনছে। এক কথায় ক্ষুদ্র অর্থায়নে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং জীবনযাত্রায় তার ছোঁয়া লাগছে।

একই সাথে এই পিছিয়ে থাকা দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের নতজানু নারীরাও এখন নিজেদের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছে। এক সময় নির্বাচন মুহূর্তে তাদের নিজেদের ভালোমন্দ ইচ্ছ-অনিচ্ছা বলতে কিছু থাকতো না। এখন আর সেরকমটি নেই। এখন তারা স্বাধীন মতামত দেয়ার ক্ষমতা রাখে। পূর্বে বাড়ির গৃহকর্তা সন্তানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে স্ত্রী বেচারির কিছু বলার থাকতো না। আত্মনির্ভরশীল মা এখন ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করাচ্ছে, মেয়ের অকাল বিয়েতে বাঁধা দিতে পারছে। শুধু তাই নয়, পাশের বাড়ির যে বালিকার অল্প বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর চেষ্টা হচ্ছে সেখানেও সে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। তাদের অনেকেই এখন স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনেও অংশ নিচ্ছে এবং নির্বাচিত হয়ে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন দ্বারা জীবন পরিবর্তনকারী নারীরা এনজিওদের প্রতি খুবই আন্তরিক ও দরদী। তারা মনে করে এদের মাধ্যমে তাদের এই পরিবর্তন। সুতরাং তারা কখনো ঋণ খেলাপি হতে ইচ্ছুক নয়। তারা মনে করে এসব প্রতিষ্ঠান বাঁচলেই তারা বাঁচবে, উন্নয়নের পথ ধরে এগুতে সক্ষম হবে।

অন্যদিকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রামের অসচ্ছল হতদরিদ্র নারীকে শুধু দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকেই মুক্ত করেনি, তার মধ্যে জাগ্রত করেছে উন্নত জীবন। তার মধ্যে জাগ্রত করেছে ভবিষ্যত স্বপ্ন। যে স্বপ্ন সেই নারীকে নির্ভরতা থেকে রেহাই দিয়েছে। তার বুদ্ধি বিবেচনাকে জাগ্রত করেছে। সেও টের পায় তার মধ্যেও আগুন আছে কিন্তু অর্থ নামক দেশলাই কাঠি ছাড়া সে জ্বলে উঠতে পারেনি– সেটি এখন তার করায়ত্ত।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন দ্বারা জীবন পরিবর্তনকারী নারীরা এনজিওদের প্রতি খুবই আন্তরিক ও দরদী। তারা মনে করে এদের মাধ্যমে তাদের এই পরিবর্তন। সুতরাং তারা কখনো ঋণ খেলাপি হতে ইচ্ছুক নয়। তারা মনে করে এসব প্রতিষ্ঠান বাঁচলেই তারা বাঁচবে, উন্নয়নের পথ ধরে এগুতে সক্ষম হবে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন শুধু নারীর ক্ষমতায়নই বৃদ্ধি করেনি দেশের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ এসডিজি'র ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ক্ষুদ্র অর্থায়নের দ্বারা তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নই দেশের স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। যে কোনো সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা, দান-অনুদান কোন ব্যক্তিকে ভিক্ষুক করে তোলে কিন্তু এনজিও/এমএফআইদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন তাকে কর্মমুখী করে। কারণ, তাকে এই ঋণ ফেরত দিতে হয়। ফলে সে বাধ্য হয়ে সংশ্লিষ্ট অর্থ আয়ের জন্য কাজে লাগায়।

প্রাক-ইসলাম যুগে আরবের অনেক নারীই ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এর বড় উদাহরণ হযরত মুহম্মদ (স.) এর স্ত্রী বিবি খাদিজা (র:) নিজেও ছিলেন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী হিসেবে স্বাবলম্বী ছিলেন বলেই তিনি কারো অনুগ্রহের শিকার ছিলেন না। সমাজে তাঁরও মতামত প্রদানের অধিকার ছিল। নারী হিসেবেও তিনি ছিলেন আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান। বর্তমানে ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে এ দেশেও লাখ লাখ গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে– যারা আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। যারা এক সময় ছিলেন এ সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের বোঝা, এখন তারা নিজেরাই 'অর্থনৈতিক শক্তি'। এটি দেশের জন্য অনেক বড় অর্জন। ইতোমধ্যে গ্রাম পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রচুর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগলের খামারসহ অন্যান্য অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা দেশের উৎপাদন সেক্টরকেও সমৃদ্ধ করেছে। বেকারত্ব হ্রাসে অবদান রাখছে। সর্বোপরি ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও এনজিওদের কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়ন ও স্থিতিশীল উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ■

● লেখক : সম্পাদক, প্রত্যয়

আইনের শাসন ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব

হাসান মাহমুদ খন্দকার

সাবেক আইজিপি ও রাষ্ট্রদূত

দেশের পুলিশ প্রশাসনের আলোকিত ব্যক্তিত্ব সাবেক আইজিপি ও সাবেক রাষ্ট্রদূত হাসান মাহমুদ খন্দকারের জন্ম পিতার চাকরির সুবাদে যশোরে হলেও তাঁর পৈতৃক বাড়ি রংপুরের পীরগাছার নবুপাঠানপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা খন্দকার আবুল হাশেম ছিলেন একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মককর্তা ও মা বেগম জয়নব একজন বিদ্যোৎসাহী নারী ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর ৭ ছেলে মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

ছোটবেলা থেকেই মেধাবী, অধ্যবসায়ী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হাসান মাহমুদ খন্দকার ১৯৭০ সালে টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৭৩ সালে ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে পুলিশের এএসপি হিসেবে টাঙ্গাইলে যোগদান করেন। একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, ডায়নামিক পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি কর্মজীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। তিনি ১৯৯৫-৯৬ সালে টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার ছিলেন। তিনি র‍্যাব এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে ৩ বছর, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে দু'দফায় ৩ বছর এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) হিসেবে ৪ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পুলিশ প্রধান। ব্যক্তি ও পেশাজীবনে অমায়িক ও সৎ এই মানুষটি দায়িত্বে থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য ২০১১ সালে বাংলাদেশ পুলিশ 'স্বাধীনতা পদক' লাভ এবং ২০১২ সালে আইজিপির পদমর্যাদা উন্নীত করে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা অর্জন করেন। চাকরি জীবন শেষে তিনি স্পেনের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং নর্থ মেসেডোনিয়া ও মাল্টার ননরেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি মাদ্রিদ ও ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন (UNWTO) এর বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন।

প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ী হাসান মাহমুদ খন্দকার পেশাজীবনে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন। তিনিই র‍্যাব এর প্রথম মহাপরিচালক। ছোট বেলায় শিক্ষকতা পেশায় যাবার একটা গোপন বাসনা ছিল। সৃষ্টিকর্তা তাঁর সে আশাও অপূর্ণ রাখেননি। তিনি ২০০৬ সালে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পান। আচার আরণে অমায়িক, ভদ্র, সজ্জন খন্দকার হাসান মাহমুদ এর স্ত্রী রোমাইয়া সামাদ। ছেলে রাশিক হাসান খন্দকার কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। মেয়ে ইরাম মোস্তফা মাদ্রিদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস পড়ছেন। পুলিশ প্রধান হিসেবে সফল ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি, অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ, দেশের আলোকিত সন্তানদের একজন হাসান মাহমুদ খন্দকার প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো :

প্রত্যয় : পেশাজীবনে আপনি দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ পুলিশ প্রধান অর্থাৎ আইজিপি ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রদূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রত্যেক মানুষেরই ছোট বেলায় একটা স্বপ্ন থাকে। আপনি কি হতে চেয়েছিলেন?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : আপনি ঠিকই বলেছেন। ছোট বেলায় প্রতিটি মানুষেরই কোন না কোন স্বপ্ন থাকে। কিন্তু আমার কথা যদি বলি তাহলে বলবো, খুব বড় কিছু হবার ইচ্ছা আমার ছিলো না। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবো তেমন কোন স্বপ্ন আমি দেখিনি। তবে শিক্ষকতা করার একটা সুপ্ত বাসনা আমার মধ্যে ছিলো। কিন্তু আমার সে বাসনা পূর্ণ হয়নি। কারণ আমাদের সমাজের বাস্তবতায় পেশা নির্বাচনে অভিভাবকদের পছন্দটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অভিভাবকদের ইচ্ছাকে মেনে নিতে গিয়ে আমার নিজের বাসনাকে ভুলে যেতে হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে পড়ালেখা করে আমি চেয়েছিলাম শিক্ষক হবো কিন্তু আমার বাবার ইচ্ছা ছিলো বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে আমি বড় একজন কর্মকর্তা হই। আমার কাছেও এক পর্যায়ে মনে হয়েছিলো, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারে বাবাই যেহেতু অভিভাবক, তিনিই প্রধান, নীতি নির্ধারক, তিনি আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন তাই তার ইচ্ছাটাকে গুরুত্ব দেয়াও আমার দায়িত্ব। এই বাস্তবতাতেই আমি আর শিক্ষকতা পেশার দিকে যেতে পারিনি। ফলে আমি বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হই। আমার সামনে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডার বেছে নেয়ার সুযোগ ছিলো। একটি পুলিশ, অন্যটি পররাষ্ট্র। তো বাবার ইচ্ছাতেই আমি পুলিশ ক্যাডার বেছে নেই। এটা ১৯৮২ সালের কথা। তবে আজ এই পর্যায়ে এসে আমার মনে হয়, বাবার সিদ্ধান্তটাই সঠিক ছিলো। তার অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টিকে আমি আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। কিন্তু শিক্ষকতার প্রতি শৈশবের সেই দুর্বলতা আমার এখনও আছে। পুলিশে যোগ দেবার পরও আমি বৃটেনে গিয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং সেখানে পুলিশের প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছি। আপনি হয়তো জানেন, পেশা জীবনের এক পর্যায়ে আমি ডিআইজি পদমর্যাদায় সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছি।

প্রত্যয় : আপনার মা-ও কি তাই চেয়েছিলেন?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমার মা পুরোপুরি বিপরীত ছিলেন। তিনি চাননি আমি পুলিশে যোগদান করি। কারণ পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে আমার বাবার সীমাহীন ব্যস্ততা তিনি দেখেছিলেন। নির্ধারিত কোন অবসর কিংবা ছুটির দিন বলেও তার কিছু ছিলো না। ঈদে বাবা আমাদের সাথে থাকতে পারতেন না। ফলে মা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না যে পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে আমিও পুলিশে যোগ দেই, বাবার মতো আমি সীমাহীন ব্যস্ততার পেশাজীবনে প্রবেশ করি। তবে শেষ পর্যন্ত বাবা মাকে বুঝাতে পেরেছিলেন।

প্রত্যয় : আপনার বাবার চাকুরির সুবাদে আপনি দীর্ঘ সময় টাঙ্গাইলে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। পড়ালেখা করেছেন বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে। টাঙ্গাইল শহর ও বিন্দুবাসিনী স্কুল কেন্দ্রিক আপনার কিছু স্মৃতি আমরা জানতে চাই।

হাসান মাহমুদ খন্দকার : বাবা দেশের অনেক জেলায় চাকরি করেছেন। আমার জন্ম যশোরে

হলেও ঐ সময়ের স্মৃতি আমার মনে নেই। বাবা যখন খুলনায় বদলী হয়ে এলেন তখন আমার বুদ্ধি হয়েছে বলতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, খুলনাতে আমাকে যে স্কুলে ভর্তি করা হয় সেটা ছিলো পুরোপুরি মেয়েদের স্কুল। আরো মজার ব্যাপার হলো, মেয়েদের ঐ স্কুলে আমিই ছিলাম একমাত্র ছাত্র। খুলনার দৌলতপুরের ঐ স্কুলটার নাম ছিলো মহসিন গার্লস স্কুল। এরকমটা ঘটার কারণ হলো, ঐ স্কুলে আমার বড় তিন বোনকে ভর্তি করে দেয়া হয়েছিলো। বাবা হয়তো ভেবেছিলেন, এই অপরিচিত শহরে আমার মতো ছোট একটি বাচ্চাকে অন্য কোথাও ভর্তি করে দেয়া নিরাপদ হবে না। আমার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই তিনি মহসিন স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলে আমাকে ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে, ক্লাস ফোর পর্যন্ত আমি ঐ স্কুলেই পড়েছি। পরবর্তীতে বাবা বদলি হয়ে যাওয়ায় আমি খুলনা জেলা স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়েছিলাম। তবে মেয়েদের স্কুলে পড়ার ব্যাপারটা যে শুধু আমার ক্ষেত্রেই হয়েছে তা কিন্তু নয়। টাঙ্গাইলে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু আছে যারা শৈশবে আমার মতই মেয়েদের স্কুলে পড়ালেখা করেছে। তবে আমার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, কারণ মহসিন স্কুলে আমিই একমাত্র ছাত্র ছিলাম আর বাকিরা ছিলো ছাত্রী।

প্রত্যয় : এর পর কি আপনি টাঙ্গাইলে এলেন?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : আমার বাবা তখন ছিলেন সার্কেল ইন্সপেক্টর, এখন বলা হয় এএসপি সার্কেল। আব্বা খুলনা থেকে নেত্রকোণা বদলি হয়ে গেলেন। তারপর টাঙ্গাইলে। ক্লাস নাইনের মাঝামাঝি সময় আমি বিন্দুবাসিনী স্কুলে ভর্তি হই। এখান থেকেই আমি ১৯৭০ সালে এসএসসি পাশ করি এবং পরে ঢাকায় এসে নটরডেম কলেজে ভর্তি হই। তারপরই তো শুরু হলো মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ। এখানে বলে রাখতে চাই, কাকতালীয়ভাবে আমিও পেশা জীবনের শুরুতে টাঙ্গাইলে বাবা যে দায়িত্বে ছিলেন সে দায়িত্ব পেয়েছিলাম। অর্থাৎ আমি পুলিশে প্রথম যোগদান করি টাঙ্গাইলের এএসপি সার্কেল হিসেবে।

প্রত্যয় : টাঙ্গাইল জীবনের কোন স্মৃতি কি বিশেষভাবে মনে পড়ে?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : আব্বার সরকারি বাসার সামনে অনেক বড় একটি মাঠ ছিলো। নাম ছিলো পুলিশ মাঠ। বাসাটা এখনও আছে। এই মাঠেই আমার অবসর কেটেছে। যতটুকু বিনোদন করার সুযোগ পেয়েছি তার প্রায় সবটুকুই হয়েছে এই মাঠে। এই মাঠেই বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলেছি, ক্রিকেট খেলছি, আড্ডা দিয়েছি। ঐ বয়সে খুব ভালো না বুঝলেও টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড আমি লক্ষ্য করতাম। সে সময় টাঙ্গাইলের অনেক নেতৃবৃন্দকে আমি দেখেছি যারা পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমি কাগমারী সম্মেলনও দেখেছি।

স্পেনে রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ এর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় হাসান মাহমুদ খন্দকার

মফস্বল শহর হলেও টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ছিলো বেশ পরিশিলিত। আমর বেড়ে উঠাটা ছিলো খুবই সুন্দর। তবে পুলিশ কর্মকর্তার ছেলে হিসেবে খুব স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছামত ঘুরাফেরা করা কিংবা সারা দিনের জন্য বাইরে থাকার সুযোগ আমার ছিলো না। ফলে বেশিরভাগ সময় কাটতো ঐ পুলিশ মাঠেই। এখানে অনেক ক্লাবের লীগ খেলা হতো। আমি হয়তো বড় খেলোয়ার হতে চাইতাম না, কিন্তু ওই খেলাগুলো আমাকেও উৎসাহিত করতো।

টাঙ্গাইলে আমার বড় একটি সময় কেটেছে পাবলিক লাইব্রেরিতে। ওখানে গিয়ে বই পড়তাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়তাম। ওই সময় আমাদের বাসায় শুধু পাকিস্তান অবজারভার রাখা হতো। ফলে আরো বেশি পত্রিকা পড়ার আগ্রহ থেকেই আমি পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়মিত যাতায়াত করতাম। ঐ সময় বিন্দুবাসিনীর হেডমাস্টার ছিলেন রাজ্জাক স্যার। ছোটখাটো এক অসাধারণ মানুষ।

আরেকটা স্মৃতি আমাকে বেশ নাড়া দেয়। ১৯৬৯ সালে টাঙ্গাইল যখন মহকুমা থেকে জেলায় উন্নিত হলো সেই অনুষ্ঠানে আব্বার সাথে আমিও গিয়েছিলাম। জেলা শহরের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন তৎকালী গভর্নর রিয়াল এডমিরাল আহসান। বিষয়টি নিয়ে আমার খুব উৎসাহ ছিলো। ঘটনাটি আমাকে এই জন্যই নাড়া দেয়, যে শহরকে আমি মহকুমা থেকে জেলা হতে দেখলাম সেই জেলারই পুলিশ সুপার হিসেবে আমি পরবর্তীতে দায়িত্ব পালন করেছি। এটা আমার জীবনের অনেক বড় একটি ঘটনা। বন্ধুবান্ধবদের সাথে বিকেল বেলায় নির্মাণাধীন ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার্টার দেখতে যেতাম। জজ কোর্ট, ডিসি-এসপির বাসাও দেখতে যেতাম। সেটা একটা অন্যরকম অনুভূতি ছিলো।

প্রত্যয় : কখনও কি আপনার মনে হয়েছে টাঙ্গাইলই আপনার নিজের জেলা?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : সেরকম মনে হয়েছে কিনা তা জোর দিয়ে বলবো না। তবে আমার অনেক সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনের অনেকেই মনে করতো আমি টাঙ্গাইলের ছেলে। তবে এটা ঠিক, টাঙ্গাইলের সাথে আমার আত্মীক একটা সম্পর্ক আছে।

প্রত্যয় : অতীতে এমনকি আপনাদের সময়ের শিক্ষকরা যেমন ছাত্রদের পড়াশোনার প্রতি খেয়াল রাখতেন, তেমনি ছাত্ররাও শিক্ষকদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। বর্তমানে ছাত্র শিক্ষকের এ ধরনের সম্পর্কের বেশ অবনতি লক্ষ্যণীয়। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেয়ে ব্যবসায়িক চিন্তাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। একজন সমাজ অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে এই অবক্ষয়ের মূল কারণ কি বলে আপনি মনে করেন। এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : খুব সুন্দর প্রশ্ন। আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন মনি বাবু ও কান্তি বাবু নামের দুজন শিক্ষক ছিলেন। আমি মনি বাবু স্যারের বাসায় গিয়ে পড়তাম আর কান্তি বাবু স্যার বাসায় এসে পড়াতেন। মনি বাবু স্যার ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে অসাধারণ ছিলেন। আমি পরবর্তীতে নটরডেমে পড়েছি, কিন্তু আমার ইংরেজির যে ভিত সেটা মনি বাবু স্যারই করে দিয়েছিলেন। আমার আজকের যে অবস্থান তার জন্য মনি বাবু স্যারকে আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে চাই। আর আমার অংকের ভিত তৈরি করে দিয়েছেন কান্তি বাবু স্যার।

আপনি যে অবক্ষয়ের কথা বলেছেন, তার বিপরীতে বলবো ঐ সময় তাদের মতো শিক্ষকরা ব্যক্তিত্ব দিয়ে নিজেদের রোল মডেল হিসেবে তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। তারা ছিলেন মহীরুহের মতো। তাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রভাবিত করতো, আমরা মূলত তাদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতাম, ভয় বা শাসনের দ্বারা নয়। আপনি নিশ্চই হিরেন স্যারকে চিনতেন, একজন সৌম্য দর্শন মানুষ। অনেক ভয় পেতাম তাকে, কিন্তু ঐ ভয়ের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিলো। কিন্তু বর্তমান যুগে এই রোল মডেল হওয়ার একটা ঘাটতি আছে। আপনি যদি ছাত্রদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করতে না পারেন, তাদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে না পারেন তাহলে তারা আপনার কথা শুনবে কেন? বলা যায়, আমাদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণটা বোধহয় কমে গেছে। একটা সময় ছেলেপুলেরা বয়োজেষ্ঠ্য কোন প্রতিবেশিকে দেখলেও হাতের সিগারেট ফেলে দূরে সরে যেতো। এটা তো শুধু ভয়ে নয়, এর মধ্যে একধরনের শ্রদ্ধাবোধও ছিলো। এটাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু সেটা তো এখন খুব একটা দেখি না। এটা এখন শিথিল হয়ে গেছে। আমার মনে হয় সামাজিক অবক্ষয়ের একটিও একটি বড় কারণ। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে, এই যে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের একটা ব্যত্যয়, এর

পেছনে আর্থ-সামাজিক অবস্থাও দায়ি। এখনকার দিনে শিক্ষকদের নানা ধরনের সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এর ফলে আমাদের সময়ের শিক্ষকদের মতো করে তারা ছাত্রদের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করতে পারছেন না। তাছাড়া একজন শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো তার বাড়ি। বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সে শুধু তার ঐ শিক্ষাটাকে বাড়িয়ে নিতে পারে মাত্র। ফলে আমাদের অভিভাবকদেরও সচেতন ও সতর্ক হওয়াটা জরুরি।

প্রত্যয় : এই যে আমাদের সমাজের অবক্ষয়, বড়দের প্রতি যুব সমাজের শ্রদ্ধার ঘাটতি কিংবা নিজেদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে বড়দের ব্যর্থতা– এর প্রভাবে কি একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি বিদেশেও তৈরি হচ্ছে না? আপনি তো রাষ্ট্রদূত হিসেবে দীর্ঘদিন দেশের বাইরে অবস্থান করেছেন, আপনার কি মনে হয়?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : এখানে দুটো দিকই আছে। এটা একটা আপেক্ষিক বিষয়। আমরা অনেকে মনে করি, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা বোধহয় একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। আমি যদি বহির্বিশ্ব বিশেষ করে ইউরোপিয় সমাজের কথা বলি তবে বলবো, সেখানেও অনেক স্খলন আছে। সেখানেও সমালোচনা করার অনেক কিছু আছে। অর্থাৎ ওরা অনেক এগিয়ে আর আমরা অনেক পেছনে- সেটা আমি বলবো না। আমাদের সমাজে অনেক ভালো ছেলে আছে। যে পরিবারগুলো চেষ্টা করেছে, তারা সন্তানকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে পেরেছে। আবার অনেকে আছে যারা তা পারেনি। কিন্তু তাই বলে আমরা তাদের চেয়ে খারাপ প্রজন্ম নিয়ে চলছি তা আমি বলতে চাই না। এটা আপেক্ষিক ব্যাপার। ভালো-মন্দ সব দেশে, সব সমাজেই আছে। ইউরোপিয়ান সমাজে গর্ব করার মতো অনেক বিষয় আছে, আবার মাথা ন্যুইয়ে রাখার মতো অনেক দিকও আছে। এটা থাকবেই।

প্রত্যয় : বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে এগুচ্ছে। মানুষের আর্থিক অবস্থারও বেশ উন্নয়ন ঘটছে। কিন্তু মানবিক গুণাবলীর সেভাবে উন্নয়ন ঘটছে না। বিশেষ করে আগে যেখানে মানুষ কোথাও কোনো ব্যক্তির উপর অন্যায় হতে দেখলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ করতো– তা এখন আর দেখা যায় না বললেই চলে। এতে সামাজিক নানা অপরাধ ও জুলুমবাজির ঘটনা ঘটছে। আপনার পরামর্শ ও প্রস্তাবনা কি?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : সমাজে যে সব অপ্রিয় বাস্তবতাগুলো বিদ্যমান সেগুলোর অনেক কারণ রয়েছে। আসলে এই কারণগুলো বিশ্লেষণ করেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন এবং বেশ জটিল। এই অস্থিরতা কিংবা বৈকল্য কিংবা ব্যত্যয়ের কারণে সমাজে অনাচার বাড়ছে, হতে পারে হতাশা বাড়ছে, অপরাধ বাড়ছে, মাদকাশক্তি বাড়ছে। এখন তো মাদকাশক্তি আমাদের জন্য অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে আমাদের দুই দিক থেকেই কাজ করতে হবে। এক দিকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং আরেক দিক দিয়ে এই সব অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র আইনের প্রয়োগ দিয়ে অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব নয়। আইন প্রয়োগ করার পাশাপাশি অপরাধ বা অবক্ষয়গুলো কেন হচ্ছে তার কারণগুলো চিহ্নিত করে সামাজিকভাবে তা প্রতিরোধ করতে হবে। অনেকে মনে করে শুধু আইন দিয়েই অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব। কিন্তু আমি তা মনে করি না। আইনের শাসন জরুরি কিন্তু একই সাথে সামাজিক আন্দোলন বা সচেতনতাটাও বেশ জরুরি।

প্রত্যয় : দেশে এক সময় এসিড সন্ত্রাস, ইভ টিজিং, চাঁদাবাজি বেড়ে গিয়েছিলো। আপনি সে সময় র‍্যাবের ডিজিও ছিলেন। তবে র‍্যাবের মাধ্যমে এই পরিস্থিতিটা সমাল দেয়া গেছে। আর আপনি যে সামাজিক আন্দোলনের কথা বললেন তার মাধ্যমে বিশেষ করে এসিড সন্ত্রাসটা বলা যায় পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

হাসান মাহমুদ খন্দকার : আপনি খুব ভালো একটা প্রসঙ্গ তুলেছেন। এই প্রক্রিয়াটির সাথে আমি নিজেও সম্পৃক্ত ছিলাম। এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে আইনের প্রয়োগ। একজন পেশাজীবী হিসেবে আমি এরকমটাই মনে করি। আইনের প্রয়োগ অর্থ হলো, একটা অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধী ধরা হবে, সুষ্ঠু তদন্ত হবে এবং তার অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি হবে। এটা একটা দিক। কিন্তু একই সাথে এটাও দেখতে হবে যে এসিড ছুড়লো, ইভটিজিং করলো অর্থাৎ অপরাধের সাথে জড়িয়ে গেলো, সে এটা কেন করলো। সেই কারণগুলোকে খুঁজে বের করে সামাজিকভাবে তা নির্মূল করতে হবে। যে সময়টায় এসিড সন্ত্রাস বা ইভটিজিং ছিলো সে সময় কিন্তু আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন মিডিয়া, সামাজিক সংগঠন এবং এনজিওগুলো সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। ফলে অপরাধের বিরুদ্ধে এর প্রভাবটা হয়েছে সুদূর প্রসারি। অপরাধী শাস্তি পেয়েছে আবার এই অপরাধের বিরুদ্ধে একটা জোড়ালো জনমত গড়ে উঠেছে। কোন অপরাধের বিরুদ্ধে যখন এ রকম কোন সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তখন অপরাধ কমে যায়। এসিড সন্ত্রাসের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

প্রত্যয় : আমাদের দেশের উন্নয়নের ধারায় এনজিওগুলো যে ভূমিকা রাখছে সে বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : আমি শুধু এনজিওদের কথা বলবো না। বিভিন্ন সেক্টরের ভূমিকায় দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে। রাষ্ট্রদূত থাকার সময় আমি দেখেছি, পশ্চিমা বিশ্বও অবাক হয়ে গিয়েছে আমাদের উন্নয়ন দেখে। এমনকি এই করোনা অতিমারির সময়ও স্পেনের পররাষ্ট্র সচিব আমার কাছে অবলিলায় জানতে চেয়েছিলেন, ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমে আমরা কিভাবে সফল হচ্ছি। আমি বলেছিলাম, দুর্যোগ মোকাবেলা করার একটি অসাধারণ সক্ষমতা আমাদের অর্জিত হয়েছে। আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এখন দক্ষতায় পরিণত হয়েছে। আমি বলেছি, দুর্যোগ মোকাবেলা করতে করতে আমরা এতোটাই অভিজ্ঞ হয়েছি যে আমাদের যদি নিষ্ঠা ও ইচ্ছা থাকে তাহলে এই অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সফল হতে পারি। প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছিলেন, তোমাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

তবে আমি মনে করি, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যতটা হয়েছে সে তুলনায় সাংস্কৃতিক বা মনোজগতের উন্নয়ন তেমন হয়নি। যার ফলে আমাদের সমাজে একটা কালচারাল ল্যাক তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের রেখা যতটা উপরে উঠেছে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের রেখা ততোটা উঠেনি। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা এখনো প্রবল রয়ে গেছে। এই পার্থক্যটা আমাদের কমিয়ে আনতে হবে। তবে আমি এও মনে করি, আগে এই পার্থক্যটা অনেক কম ছিলো। এখন সেটা নেই। কারণ আমাদের সমাজে সাংস্কৃতিক আবহটা আগে যতটা স্পষ্ট ছিলো, সে তুলনায় এখন অনেক অস্পষ্ট।

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যতটা হয়েছে সে তুলনায় সাংস্কৃতিক বা মনোজগতের উন্নয়ন তেমন হয়নি। যার ফলে আমাদের সমাজে একটা কালচারাল ল্যাক তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের রেখা যতটা উপরে উঠেছে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের রেখা ততোটা উঠেনি। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা এখনো প্রবল রয়ে গেছে। এই পার্থক্যটা আমাদের কমিয়ে আনতে হবে।

প্রত্যয় : অনেকেরই অভিযোগ খোলামেলা আকাশ সংস্কৃতি অবক্ষয় বাড়িয়ে দিচ্ছে। জাতীয় জীবনে আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : আমি মনে করি, সাহিত্য কিংবা সংস্কৃতি সময়ের প্রতিফলন, সময়ের সৃষ্টি। '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় যে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিলো সেগুলোও কিন্তু ছিলো সময়ের সৃষ্টি। এগুলো ধারণ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। সেই সময়ে যে ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তারা যা চিন্তা করেছেন, তা সৃষ্টি করেছেন এবং ধারণও করতে পেরেছেন। এখনও ঐ উদ্দিপনাটা আমাদের আনতে হবে। এক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনা নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমি মনে করি, একাত্তরের পরে দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়েছে। একাত্তরের আগে যা হয়েছে তার কেন্দ্র ছিলো মুক্তির সংগ্রাম অর্থাৎ আমাদের মুক্ত হতে হবে। কিন্তু একাত্তরের পরে যা হবে তার কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

প্রত্যয় : পুলিশ ও র‍্যাবের প্রধান হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন। কিছু সফলতার কথা বলুন।

হাসান মাহমুদ খন্দকার : সফল হয়েছি নাকি বিফল হয়েছি বিষয়টিকে আমি সেভাবে দেখতে চাইনা। আমি মূল্যায়ন করবো আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি পালন করতে পেরেছি কিনা। আমি সব সময়ই একশতে একশ পাবো তা মনে করি না। আমি আমার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করেছি। সেখানে আমার অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে, ব্যত্যয় থাকতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও থাকতে পারে। তবে আমার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কোন অভাব কখনই ছিলো না। পেশাজীবনের শুরুতে আমি যখন নিম্ন পর্যায়ের দায়িত্বে ছিলাম তখনও যেমন নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছি, আবার যখন একেবারে শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছি তখনও একই চেতনা নিয়ে কাজ করেছি।

আর সুখস্মৃতির কথা যদি বলি, তবে বলবো, যখন রাষ্ট্রদূত ছিলাম তখন প্রায়ই আমি হাঁটতে বের হোতাম। একদিন লেকের পাশ দিয়ে হাটার সময় এক ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে আনন্দের সাথে বললেন, আমি তার অনেক বড় একটি উপকার করেছি। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু আমি মনেই করতে পারছিলাম না তার জন্য ঠিক কি করেছিলাম। কিন্তু এই ঘটনাটি আমাকে আনন্দিত করেছিলো এই ভেবে যে, একজন অপরিচিত মানুষের উপকারে আমি আসতে পেরেছিলাম। আর তার ঐ অভিব্যক্তিতে আমার মনে হয়েছে একজন পেশাজীবী হিসেবে আমি বোধহয় ব্যর্থ হইনি।

প্রত্যয় : আপনার পেশাজীবনে এরকম ঘটনা আরো নিশ্চই আছে?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : এরকম বহু ঘটনা আছে। এটা শুধু আমিই করেছি তা নয়। পুলিশের বড় একটা সুযোগ আছে মানুষকে সেবা দেবার। এটা পেশাগত বৈশিষ্টের কারণেই। যিনি চাইবেন তিনি এটা করতে পারবেন। পুলিশের অধিকাংশ সদস্যই কিন্তু তাই করেন। আর করেন বলেই সমাজে এখনো ভারসাম্য আছে। এই কারণে ছিনতাই ও পকেট মারাসহ কিছু কিছু অপরাধ একেবারেই কমে গেছে। এটা কেন কমে গেছে? মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার যেমন উন্নতি হয়েছে, তেমনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা ও দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতাও কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে। ইকোনমিক্সের ভাষায় 'রেশনাল চয়েস থিওরি' বলে একটা কথা আছে। অপরাধ যে করে সে কিন্তু 'কস্ট বেনিফিট' দেখে। অর্থাৎ সে দেখে তার কাজের ঝুঁকির তুলনায় বেনিফিট কতো। অপরাধী যখন দেখে ঝুঁকির তুলনায় লাভ কম তখন কিন্তু সে আর সেই অপরাধ করে না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এখনো আন্তরিক আছে বলেই অপরাধীদের এভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও আছে। মাদকাসক্তি এখনো আমাদের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ। এগুলোও আশা করা যায় একসময় দূর হয়ে যাবে।

প্রত্যয় : প্রায় প্রতিটি মানুষেরই কর্মক্ষেত্র বা ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধতা থাকে। এতে করে একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কিছু করা হয়ে ওঠে না বা পারা যায় না। আপনার জীবনে একরকম কোনো ব্যর্থতা কিংবা বলা যায় হতাশাব্যাঞ্জক কোনো ঘটনা ঘটেছে কি যা আপনাকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : আগেই বলেছি, ছোট বেলা থেকেই আমার ইচ্ছা ছিলো শিক্ষকতা করবো। লেখাপড়া ও গবেষণার মধ্যে থাকবো। কিন্তু পারিবারিক বাস্তবতায় সেটা আর হয়ে উঠেনি। কিন্তু পুলিশে চাকরি করেও আমি নানাভাবে শিক্ষকতার স্বাদ পেয়েছি। আমি সারদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলাম। তাছাড়া দেশে-বিদেশে পুলিশ বাহিনীর জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে আমি প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। যুক্তরাজ্য থেকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশ সদস্যরা এসেছিলো, আমি তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এটা আমার জন্য বিশেষ আনন্দের সময় ছিলো।

প্রত্যয় : আপনি এখন অবসর যাপন করছেন। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : আমার ইচ্ছা আছে শিক্ষা ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত হওয়ার। এটা সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমেও হতে পারে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হতে পারে কিংবা লেখালেখি বা মিডিয়ার মাধ্যমেও হতে পারে।

প্রত্যয় : রাজনীতি করার কোন পরিকল্পনা আছে?

হাসান মাহমুদ খন্দকার : না, তা নেই। রাজনীতি করার যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি মনে করি না।■

বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়নের পেছনে এনজিও খাতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে

কে. এম. তারিকুল ইসলাম

মহাপরিচালক (গ্রেড-১), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রশাসন ক্যাডারের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও মেধাবী ব্যক্তিত্ব কে. এম. তারিকুল ইসলাম এর জন্ম মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। গত ২০২১ এর ১ জুন তিনি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) পদে যোগদান করেন। এ পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মেধাবী ছাত্র কে. এম. তারিকুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে বি.কম (অনার্স) ও একই বিষয়ে এম.কম ডিগ্রি অর্জন করেন।

পড়াশোনা শেষে তিনি বিসিএস নবম ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। মাঠ প্রশাসনে ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই কর্মকর্তা বিভাগীয় কমিশনার- রংপুর, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার- ঢাকা, জেলা প্রশাসক- বান্দরবান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক- টাঙ্গাইল ও গোপালগঞ্জ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার- বালাগঞ্জ, সিলেট ও মধুখালী, ফরিদপুর এবং সহকারি কমিশনার (ভূমি)- গোয়াইনঘাট, সিলেটসহ মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সহকারী পরিচালক পদে রাঙ্গামাটি, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় কর্মরত ছিলেন। বিভিন্ন অধিদপ্তর ও কর্তৃপক্ষের পরিচালক ও সদস্য পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে।

তিনি দাপ্তরিক প্রশিক্ষণে ভারত, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর করেন। ব্যক্তি জীবনে অমায়িক ও আচার আচরণে বন্ধুসুলভ। তারিকুল ইসলাম ২ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তানের জনক। সম্প্রতি এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক আত্মপ্রত্যয়ী কে. এম. তারিকুল ইসলাম প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ণ করছেন। উন্নয়নের এই ধারায় বৈদেশিক অনুদান প্রাপ্ত এনজিওগুলো কিভাবে এবং কতোটা ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

কে. এম. তারিকুল ইসলাম : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্তমান ধারা অত্যন্ত ইতিবাচক। এক সময়ের পশ্চিমা বিশ্বের ভাষায় কথিত 'তলা বিহীন ঝুড়ি'-দুর্ভিক্ষে জর্জরিত দেশটি আজ বিশ্বজয়ের নবতর অভিযাত্রায় এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ আর স্বল্পোন্নত দেশ নয়। উন্নয়নশীল সফল রাষ্ট্র। ইতোমধ্যেই আমরা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ২২২৭ ডলার। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে অচিরেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে ও পরবর্তীতে উন্নত দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। উন্নয়নের এ ধারায় সরকার

প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বই সবচেয়ে বড়া নিয়ামক। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিব মহোদয়গণ জনগণের প্রয়োজন সম্পর্কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বর্তমান উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছেন। উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহযোগিতা করছে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীগণও।

উন্নয়নের এ ধারায় বৈদেশিক অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'এনজিও' এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান 'এমএফআই' সমূহের ভূমিকাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের প্রত্যন্ত জনপদ, দুর্গম এলাকা এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নয়নে এনজিও-দের বিশেষ নেটওয়ার্ক লক্ষ্যণীয়। তারা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করে থাকেন এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকেন। স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, অনুদান বিতরণ, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, দান অনুদান প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান, সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের উন্নয়নে এনজিও-রা ভূমিকা রাখছে।

সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতেও ব্যাপক অবদান রাখছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণে যে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেছেন তা অর্জনে এনজিও সেক্টরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এনজিওদের দ্বারা গ্রামীণ প্রান্তিক পর্যায়ের নারীরাও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে অশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। এতে নারীর ক্ষমতায়নও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রত্যয় : দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন এনজিও বিদেশি দাতা সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট থেকে সাহায্য নিয়ে আসে–পরবর্তীতে সেই আর্থিক সাহায্য আপনাদের এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে ছাড় হয়ে থাকে। প্রতিবছর আনুমানিক কি পরিমাণ বিদেশি সাহায্য এনজিওদের মাধ্যমে আসে বলবেন কি? তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় আপনারা কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন?

কে. এম. তারিকুল ইসলাম : বৈদেশিক মুদ্রায় যে অনুদান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে এনজিওদের অনুকুলে প্রদান করা হয় তা বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ অনুসারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমেই ছাড় করা হয়। দাতা সংস্থার প্রত্যাশাব্যাঞ্জক বা ঘোষণামূলক বিবৃতি তথা Letter of Intent সহ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে বিষয়ভিত্তিক প্রকল্প দাখিল করে। পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত প্রকল্প অনুমোদন এবং প্রকল্পের অর্থছাড় করা হয়ে থাকে। এ খাতে প্রতি বছর গড়ে কম বেশী ৮০০০ (আট হাজার) কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আসে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন তদারকি করে। এনজিও'রা তাঁদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে প্রতিবেদন দিয়ে থাকে। সাথে তালিকাভুক্ত সিএ ফার্ম দ্বারা অডিট করিয়ে অডিট রিপোর্ট দাখিল করে থাকে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন থেকে

কর্মোত্তর প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করা হয়। এভাবে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো এনজিওদের কাজ কর্মের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে।

প্রত্যয় : বৈদেশিক অনুদান ব্যবহারে অনিয়ম হলে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন? এ ধরনের কোনো উদাহরণ আছে কি?

কে. এম. তারিকুল ইসলাম : বৈদেশিক অনুদান ব্যবহারের নিয়মকানুন বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ এর অধীনে জারীকৃত পরিপত্রে বর্ণিত রয়েছে। সে অনুসারে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন এনজিও বৈদেশিক অনুদানের অর্থ ব্যয় করতে পারে না। মূলতঃ বৈদেশিক অনুদানের অর্থে প্রকল্প গ্রহণ বা অনুমোদনের আগে ব্যাংকও টাকা ছাড় করতে পারে না। সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো অনুমতি দিলেই কেবল সংস্থার মাদার অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রার সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা ব্যাংকে জমা থাকে এবং অর্থ ছাড়ের পত্র ইস্যু করলে ব্যাংক উক্ত জমাকৃত অর্থ ছাড় করে থাকে। এ নিয়মের ব্যত্যয়ের কোন সুযোগ নেই। ব্যত্যয় হলে এনজিও'র নিবন্ধন বাতিলের মত চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

প্রত্যয় : দেশব্যাপী এনজিওদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে দেখভাল করার জন্য আপনাদের অবকাঠামোগত বিস্তৃতি ও অধিক লোকবলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আপনার কোন প্রস্তাবনা আছে কি?

কে. এম. তারিকুল ইসলাম : এনজিওদের কাজ কর্মে অনেক বৈচিত্র এসেছে। উন্নয়ের পাশাপাশি মানুষের ভোগবৈচিত্র, চাহিদা, সংস্কৃতি ও অভ্যাসে নানাবিধ পরিবর্তন এসেছে। দাতা সংস্থা সমূহের অর্থ প্রদানের শর্তেও পরিবর্তন এসেছে। এক সময়ে পণ্য সামগ্রী বিতরণের মধ্যেই এনজিওদের কার্যক্রম সীমিত ছিল। এখন পণ্যসামগ্রী বিতরণের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় sustainable development এ। এজন্য পণ্য বিতরণের পাশাপাশি ঐ পণ্য ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। যাতে সে তা ব্যবহার করে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে পারে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা হয় যাতে ভবিষ্যতে একই সাহায্য তাকে আর প্রদান করতে না হয়। সমাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা

হয়। এজন্য প্রচুর সভা, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন করা হয়। অনেক বিষয়ে এনজিও'রা গবেষণা করে থাকে। সরকারের পলিসি ইস্যুতে পরামর্শমূলক টক-শো ইত্যাদি আয়োজন করা হয়ে থাকে এনজিওদের দ্বারা। ফলে এসব কাজ কর্ম তদারকীর জন্য এনজিও ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধি করা আবশ্যক। বিশেষতঃ মাঠ প্রশাসনে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের কাজের পরিধি ব্যপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এনজিওদের কার্যক্রম তদারকীর জন্য বিকল্প চিন্তা করা দরকার। সে জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিজস্ব জনবল মাঠ পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। আপাততঃ ৮ বিভাগে ৮ জন উপপরিচালকের পদ সৃজনের একটি কার্যকর পরিকল্পনা ব্যুরোর রয়েছে যারা

এনজিওদের দ্বারা বাস্তবায়িত স্বীয় অধিক্ষেত্রের প্রকল্পগুলো নিয়মিত মনিটরিং করবেন।

প্রত্যয় : বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে এবং সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ থেকে এসডিজি অগ্রগতি বিষয়ক সম্মাননা লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে আপনার সংস্থার আওতাধীন এনজিওগুলোর কার্যক্রম ও অবদান সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

কে. এম. তারিকুল ইসলাম : সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু সুচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্যোগ, মাতৃত্ব ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, নারীর প্রতি সহিংসতা দমন, বাল্য বিবাহ নিরোধ ইত্যাদিতে বাংলাদেশ এখন অন্যান্য দেশের কাছে অনুকরণীয়। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪টি দেশের মধ্যে ৭২তম। ২০১৬ সালে ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার দেশকে ২০২১ সাল নাগাদ একটি মধ্যম আয়ের রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পথমানচিত্র এখন ছুঁয়ে ফেলেছে। সার্বিকভাবে লিংগ বৈষম্যের দিক দিয়ে বাংলাদেশ ১১১তম যেখানে পাকিস্তান ১২৩ ও ভারত ১৩৩ নম্বরে। নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয় পৃথিবী জুড়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওয়ার্ক প্রদত্ত এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার লাভ করেছেন। দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণের সার্বজনীন আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের সঠিক পথে অগ্রসরের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। বাংলাদেশের এ অবস্থানে আসার পেছনে বেসরকারী সংস্থাসমূহের অবদানও অনস্বীকার্য। কারণ দারিদ্র্য দূরীকরণ বিশেষতঃ চরম দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ ঘটানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, নারীদের সামাজিক অবস্থান সৃষ্টি, নারী শিক্ষার প্রসার, জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় সামর্থ্য, ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে এনজিওদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

প্রত্যয় : এ দেশে এনজিও সেক্টরের অনেক প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত যা এমআরএ এর নিয়ন্ত্রণাধীন। আপনাদের সাথে এমআরএ'র কার্যক্রমের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন?

কে. এম. তারিকুল ইসলাম : এনজিও বলতে শুধু এনজিও ব্যুরোতে নিবন্ধিত সংস্থাই বুঝায় না। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমবায় বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় বা যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটিতে নিবন্ধিত বহু সংস্থা রয়েছে যারা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণসহ দারিদ্র্য দূরীকরণের অনেক কাজে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যার সংখ্যা ৫০/৬০ হাজারের উর্ধ্বে হবে। ঐ সব এনজিওদের সীমিত সংখ্যক সংস্থা এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে নিবন্ধিত যার সংখ্যা ২ থেকে আড়াই হাজার হবে। কিন্তু ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কাজে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ন্যূনতম সম্পৃক্ততা নেই। একই সংস্থা একাধিক প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত থাকতে পারে। একই নামে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণও করতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রমের সাথে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মোটেই সংশ্লিষ্ট নয়। সরকারের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি তাদের কার্যক্রম দেখাশোনা করে থাকে।

প্রত্যয় : বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে এনজিও খাতের অবদান কতোটা বলে আপনি মনে করেন? বৈদেশিক অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর জন্য কোন বিশেষ খাতের প্রতি আপনাদের অগ্রাধিকারমূলক পরামর্শ থাকে কি?

কে. এম. তারিকুল ইসলাম : বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি সেক্টরেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিওসমূহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টিসহ কৃষকদের উন্নত বীজ বিনামূল্যে বিতরণ, বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, জৈব সার ব্যবহার পদ্ধতি, ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার ব্যতীত ফসল উৎপাদনে সহায়তামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে কৃষি সেক্টরেও বিপ্লব ঘটিয়েছে বাংলাদেশ। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এনজিওসমূহ দাতা সংস্থার কাছে Need based demand place করতে পারে। বিশেষতঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষ রোপণ, দক্ষতা উন্নয়ন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য বা শিক্ষা খাতে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে দাতা সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।■

এনজিও খাত দ্বারা কোটি কোটি মানুষ উপকৃত কিন্তু মূল্যায়ন নেই

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক
ইকো-সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ESDO)

দেশের এনজিও সেক্টরের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ইকো সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক আলোকিত উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর জন্ম ১৯৬৮ সালের ১ মে ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার রাজবাড়িতে। ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী শহীদ উজ জামান ১৯৮৪ সালে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি এবং ১৯৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভগে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে সম্মানসহ স্নাতক এবং ১৯৯০ সালে একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ড. জামান ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল ও ২০১০ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কনফারেন্সে কুড়িটিরও অধিক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। ভ্রমণ করেছেন কুড়িটিরও বেশি দেশ। প্রতিষ্ঠা করেছেন লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ, ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল, ইকো ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ইআইটি) এবং ঠাকুরগাঁও জেলার মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র স্মৃতিসৌধ 'অপরাজেয়-৭১' সহ অনেক প্রতিষ্ঠান। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Thomson Reuters Foundations এর Trust Conference Changemaker 2019.
তিনি এক পুত্র সন্তানের জনক। স্ত্রী সেলিমা আখতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ইকো কলেজ, ঠাকুরগাঁও-এ অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত। একমাত্র পুত্র শাশ্বত জামান দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। ড. জামান বর্তমানে তাঁর নিজেরই প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংস্থা ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। সম্প্রতি প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেন, তা উপস্থান করা হলো:

প্রত্যয় : একটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ইকো শব্দটি কেন বেছে নিলেন?

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান : আমরা যাত্রা শুরু করেছি ১৯৯৮ সালে। ইকো-সোস্যাল ডেভেলপমেন্টের নিক নেম হচ্ছে ইকো। এখানে আমরা ২টি কনসেপ্ট ব্যবহার করি– একটি হচ্ছে ইকোনমিক্যাল অন্যটি এনভায়রনমেন্টাল। ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড সোস্যাল বিষয়টি এরকম না; ইকো হচ্ছে ইক্যুয়াল। ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কখনোই টেকসই হবে না যদি সেটি এনভায়রনমেন্টের সাথে কমপ্লায়েন্স না করে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর সেটি মুখ থুবরে পড়বে। সুতরাং ইকোনমিক্যাল এবং এনভায়রনমেন্টাল দুটোই টেকসই উন্নয়নের জন্য খুবই সমন্বিত একটি বিষয়। এ কারণেই ইকো শব্দটিকে আমরা প্রমিনেন্ট হিসেবে ব্যবহার করি। আর সোস্যাল হচ্ছে এ দুটির ক্রসকাটিং। কারণ যখন মানুষ আউটপুট লেবেলে কাজ করবে তখন শুধু ইকোনমিক্যাল বা এনভায়রনমেন্টাল কাজ করলেই হবে না। এটিকে মিট করতে হবে কনটেস্টের সাথে। আপনি যদি নারী উন্নয়নের কথা বলেন বা অন্যান্য ভালনারেবল কথা বলেন, সেই ভালনারেবল কত গভীরে প্রোথিত তার পেছনে মূল পার্থক্য হচ্ছে স্ট্রাকচার। সেখানে যদি নার্সিং না করা যায় তাহলে জায়গাগুলো টিকিয়ে রাখা যাবে না। এই কনসেপ্ট থেকেই ইএসডিও (ESDO) এর প্রতিষ্ঠা।

প্রত্যয় : সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনীতির সম্পৃক্ততা আছে। এনভায়রনমেন্ট এর সাথে এটি কিভাবে সম্পৃক্ত? কোন কোন জায়গায় কাজ করে এই জিনিসটির সাথে সমন্বয় হচ্ছে?

শহীদ উজ জামান : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এনভায়রনমেন্ট ইস্যুকে টেকসই করার যে প্রচেষ্টা তার চেয়ে বড় প্রচেষ্টা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন, এই ডিগ্রেডেশনকে অনেকভাবে রিডিউস করা যায়। ধরুন, বাংলাদেশে অনেকগুলো নদী ছিল যার বৃহৎ অংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটি পরিবেশ, সমাজ এবং অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। এই জায়গাতে আমাদের অনেক কাজ করার আছে। আমাদের একটি রিভার মিউজিয়াম আছে। এটিকে তৈরি করা হয়েছে মানুষকে সচেতনতার

বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য। এই রিভার গ্যালারিতে বাংলাদেশের সব নদীর জল রাখা আছে। নদী বিষয়ক সকল তথ্য এই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এটি একটি দৃষ্টান্ত।

পরিবেশগত আরেকটি সচেতনতার বিষয় হচ্ছে প্লান্টেশন। বাংলাদেশে আমরা গত ৩০ বছরে প্রায় ১ কোটির মত গাছ লাগিয়েছি। শুধু গাছ লাগানোই না, আমরা প্রমোট করতে চেষ্টা করেছি সেখানে থেকে যাতে আর্নিং আসে। কুড়িগ্রামের যে ছিটমহলগুলো হ্যান্ডওভার করা হয়েছে সেগুলোতে আমরা লক্ষ লক্ষ বাশক গাছ লাগিয়ে গ্রিন করে দিয়েছি। এছাড়া বন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন ফল গাছও লাগিয়েছি।

তৃতীয় হচ্ছে বাংলাদেশে এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ সেটি হচ্ছে ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট। বেসিক্যালি এটি হচ্ছে আরবান গার্বেজ দিয়ে। সিটিতে যে হারে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে সেখানে যখন একটি হাউসহোল্ড বাড়বে তখন সেখানে প্রতিদিন সাড়ে ৭ থেকে ১০ কেজি গার্বেজ হবে। এ জন্য যত ধরনের প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আছে সেটি কিন্তু খুব ইমপ্রেসিভ না। বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সলিড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট। এ দেশের কোনো শহর ক্লিন পাওয়া যাবে না। আমাদের অনেকগুলো পাইলটিং আছে। আমরা নারায়ণগঞ্জ, ঠাকুরগাঁওয়ে গার্বেজ রিসাইকেল নিয়ে কাজ করছি, রংপুর-গাইবান্ধা মিউনিসিপালিটির ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছি।

আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ৩২-৩৫ কোটি এবং এর মধ্যে প্রায় ৭০% মানুষ শহরে বাস করবে। এই অধিক জনসংখ্যার জীবন যাপনে যে গার্বেজ হবে, এনভায়রনমেন্টে এর যে প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে কিন্তু আমরা ভাবছি না। আমরা ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারের কথা ভাবছি। এক সময় এটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ হবে বাংলাদেশের জন্য। এই জায়গাতে আমরা খুব বড় করে না হলেও পাইলটিং করছি। আমরা জানি বাংলাদেশে পলিথিন একটি মারাত্মক সমস্যা। পলিথিন মাটিতে কখনো মেশে না। এর ফলে শস্য উৎপাদন মারাত্মক ব্যাহত হয়। আমরা নারায়ণগঞ্জে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। সেখানে যারা ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে তারা যদি মিশ্রিত না করে আলাদা আলাদা করে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে তাহলে তাদেরকে একটা প্রণোদনা দেবো। এটি ছোট আকারের একটি পাইলটিং এবং বাংলাদেশে আমরাই প্রথম। অতীতে কেউ এটি করেনি।

বাংলাদেশে পরিবেশের আরেকটি ঝুঁকি হচ্ছে ব্রিক ফিল্ড। ব্রিক ফিল্ডের চিমনি দিয়ে বের হওয়া কার্বন-মনোক্সাইড মিশ্রিত কালো ধোয়া বিষয় নয়, বিষয় হচ্ছে ক্রপ সয়েল (ফসলের মাটি) কাটা হচ্ছে। একটি ফার্টাইল ক্রপ সয়েল তৈরি হতে সময় লাগে ১শ' বছর। অথচ আমরা শস্য উৎপাদনের সেই মাটিটা কেটে ব্রিক বানাচ্ছি। অথচ আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়া যাদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ বেশি সেখানে কিন্তু ৩০ বছর আগেই আইন করে ব্রিক ফিল্ড বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

প্রত্যয় : তাহলে কোন জায়গা থেকে ব্রিক সয়েল কালেক্ট করা হবে? অল্টারনেটিভ কি?

শহীদ উজ জামান : ইনস্টিড অব ক্রপ সয়েল আপনি ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে স্যাক্রিফাইস করতে পারবেন না। দিন যত যাবে বিল্ডিং বাড়বে, মানুষের প্রয়োজনীয়তা বাড়বে, ডেভেলপমেন্ট বাড়বে। গোটা দুনিয়াজুড়ে ৩/৪ ধরনের অল্টারনেটিভ আছে। স্যান্ড (বালি) থেকে ব্রিক করা যায়। যেহেতু আমরা ভাটিতে আছি তাই প্রোপারলি স্যান্ড কালেক্ট করে সেটা দিয়ে ব্রিক করা যায়। এটি দিয়ে 'হলো ব্রিক' তৈরি করা যায়, যেহেতু 'হলো ব্রিক' করতে কাঠ-খড় পোড়াতে হয় না তাই এনভায়রনমেন্টের কোনো ক্ষতি হয় না। এটা রোদে শুকিয়ে করা হয়। এটি পৃথিবীর সব দেশেই পাওয়া যায়।

আমাদের ট্র্যাজেডি হচ্ছে আমাদের জমির পরিমাণ সীমিত অথচ সেই জমি কেটে ইট বানিয়ে আমরা ভারতে রপ্তানি করি। ইন্ডিয়ার অনেক জায়গা থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মাটি কেটে ব্রিক তৈরি করে না।

আমরা 'হলো ব্রিক' তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছি। বাংলাদেশ বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা এটা শুরু করেছি।

এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আরো কয়েকটি কাজের মধ্যে আছে– আমরা যে রাইস খাচ্ছি সেটি হচ্ছে পলিশড রাইস। এর মধ্যে আসলে কোনো পুষ্টিকর উপাদান নেই। যত ধরনের পলিশড সরু চাল দেখা যায় এগুলো আসলে সরু না। মেশিনে কেটে সরু বানানো হয়। ফলে রাইসের মধ্যে যে ফুড গ্রেইন থাকে সেটি আর থাকে না। তাই এনভায়রনমেন্ট, নিউট্রিশনের জায়গা থেকে আমরা এখন ফুড গ্রেইন রাইস উৎপাদন করছি। ESDO এখন ১১০টা প্রজেক্ট চালায়। ৪১টা

দাতা সংস্থা ESDO কে ফান্ডিং করে।

প্রত্যয় : আপনি যে বিষয়গুলো এতো সুন্দর করে উপস্থাপন করলেন অর্থাৎ একটি মডেল তৈরি করেছেন এর সুফল দেশব্যাপী কিভাবে ঘরে ঘরে পৌছানো যায় যাতে মানুষ উপকৃত হয়? এতে কি সরকারের কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন কিংবা কোনো এনজিও যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করে–

শহীদ উজ জামান : ধন্যবাদ। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি আপনি যদি কোনো জিনিসকে বিপুল লোকের সাহায্যের জন্য মেইন স্ট্রিম করতে চান তাহলে সরকারের সহযোগিতা ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। সরকার হচ্ছে যে কোনো রাষ্ট্রের জনগণের জন্য সবচেয়ে

ডিপেন্ডেবল। আর এনজিও/এমএফআই বা যেকোনো প্রাইভেট সেক্টর হচ্ছে এক ধরনের এনহেনসিং সাপোর্টিং গ্রুপ ফর দ্যা কোম্পানি। সুতরাং আমাদের চেষ্টা থাকে সবসময় পলিসি অ্যাডভোকেসিতে কাজ করা যাতে এই উদ্যোগগুলো সরকারের কনফিডেন্সে নিয়ে আসা যায়। এর ফলে সরকার বিবেচনা করতে পারে, এগুলো সরকারের কাজে আসে।

আপনাকে একটা উদাহরণ দেই। আদিবাসীদের যে জায়গাজমি সেগুলো নানা কায়দায় নানা কৌশলে অত্যন্ত প্রভাবশালী বাঙালিরা অত্যাচার করে দখল করে নিয়েছে। এতে করে অনেকে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, অনেকে ভূমিহীন হয়েছে। আমরা এই ইস্যু নিয়ে ১২/১৪ বছর কাজ করে এটাকে মেইনস্ট্রিম করেছি। আমরা এমন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করেছি এই অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য যে নতুন করে জমিহারা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আর এটা আমরা সরকারকে নিয়ে করেছি কিন্তু কখনো ক্রেডিট ক্লেইম করিনি যে এটা ESDO করেছে। আমরা বলি সরকার করেছে। কারণ সরকারের ভিতর যদি ওনারশীপ তৈরি হয় তাহলে ঐ লোকগুলো উপকৃত হবে। ESDO বা যেকোনো এনজিও আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে কিন্তু সরকার আজীবন টিকে থাকবে। আপনি যদি ওনারশীপ সরকারকে দিয়ে দেন তাহলে আপনার ক্রেডিটের দরকার নেই। আপনি অন্তত এটুকু শান্তি পাবেন যে, এই মডেলটার কারণে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

ESDO কে অনেকেই হয়তো চেনে না। আমাদের জন্য যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলোকে কিভাবে আমরা সরকারের মূল ধারার মধ্যে পুশ করতে পারি।

প্রত্যয় : ইকো ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা আপনি বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন। তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে আপনার এই চিন্তা-ভাবনা বাস্তবায়ন হলে আমরা পরিবেশ দূষণ থেকে দূরে থাকতে পারবো?

শহীদ উজ জামান : আমরা সবাই একটা কমন ফ্রেজ ব্যবহার করি যে Prevension is better than cure. আমাদের দেশে স্বাস্থ্য খাতে অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে সরকারকে আমাদের রিকগনাইজড করতে হবে। সেখানেও আমরা অনেক করেছি। বর্তমান সরকার যখন প্রথম ক্ষমতায় আসে তখন তারা কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছিল কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এটি বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসে তখন পুনরায় ক্লিনিকগুলো চালু করে। এটি এই সরকারের একটি অসাধারণ ভালো কাজ।

ESDO দেশব্যাপী প্রায় ২ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়নে কাজ করছে। এটির সুফল বাংলাদেশ পেয়েছে। এটা ঠিক যে স্বাস্থ্য খাত নিয়ে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। তার পরেও এ খাতে ভালো কাজ হচ্ছে। এক সময় এ দেশে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৯ বছর; বর্তমানে তা ৭২ বছর। শিশু মৃত্যুর হার সারা বিশ্বের মধ্যে অনেক কম। প্রিভেনশনের যে কথাটি বললেন এটি একটি চ্যালেঞ্জ। মানুষ বেঁচে থাকছে কিন্তু সুস্থভাবে বেঁচে থাকছে না। নানা কারণে এই ক্রাইসিসগুলো তৈরি হচ্ছে। এর দুটি কারণ– একটি হচ্ছে ফুড হ্যাবিট অন্যটি অল্টারনেটিভ ফুড। আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যের সাথে যে বিষয়গুলো যুক্ত করা হয় এটি একটি চ্যালেঞ্জ। আরেকটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে স্ট্রিট ফুড। বাইরের দেশে এমনকি থাইল্যান্ডেও অনেক হাইজেনিকভাবে, বক্সের মধ্যে ঢেকে রেখে স্ট্রিট ফুড বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে তা হচ্ছে না। এ বিষয়ে আমরা রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাথে কাজ করছি।

প্রত্যয় : মাইক্রোফিন্যান্স নিয়ে আপনারা কাজ করছেন। কোন কোন খাতে আপনারা কাজ করেন?

শহীদ উজ জামান : প্রথমত, মাইক্রোফিন্যান্স আমাদের মেইন অপারেশন না। আমরা মাইক্রোফিন্যান্সকে মনে করি টুলস। আমি মনে করি মাইক্রোফিন্যান্সের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কারণ, এই টুলস না থাকলে বাকি টুলসগুলোর প্রয়োজন হবে না এবং একই সময়ে বাকি টুলসগুলো প্রোভাইড করতে না পারলে মাইক্রোফিন্যান্স সাসটেইন করতে পারবে না। এটি হচ্ছে আমাদের লজিক।

ESDO পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার ৯ মাস পরে তাদের পার্টনার হয়েছে। ইন্টারেস্টিং হলো যে ESDO ৪৯টি জেলায় কাজ করে কিন্তু মাইক্রোফিন্যান্স নিয়ে ১৩/১৪টি জেলার বেশি অঞ্চলে কাজ করে না। আমাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে যেখানে আমরা ইন্টিগ্রেটেড সাপোর্ট দিতে পারব না সেখানে আমরা মাইক্রোফিন্যান্স নিয়ে যাবো না। আর ইনভেস্টমেন্টের কথা যদি বলেন, তাহলে বলবো যে, সবাই ট্রাডিশনালি যেটি করে সেটি হলো কৃষি। আমরাও করি তবে আমরা ভিন্ন যেটি করি সেটি হচ্ছে মোজারেলা চিজ। এটি বাংলাদেশের আর কোথাও করে না। আমরা চিন্তা করলাম যেহেতু এই অঞ্চলে দুধের দাম কম সেক্ষেত্রে এখানকার মহিলাদের যদি চিজ তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে মাইক্রোঅন্ট্রাপ্রেনার

করা যায় তাহলে তো এ খাতে ভালো কাজ হয়। এখন বাংলাদেশের চিজের ক্যাপিটাল হচ্ছে ঠাকুরগাঁও। আমাদেরকে অনেকেই প্রশ্ন করেন যে আপনারা একটা দৃষ্টান্তের কথা বলেন যেটা আপনারা করেছেন। আমরা তখন বলি যে যদি মাইক্রোফিন্যান্সের আউটপুট দেখতে চান তাহলে দেখবেন যে বাংলাদেশের একটা জায়গাকে আমরা চিজের রাজধানী বানিয়ে দিতে পেরেছি।

প্রত্যয় : মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ এবং মাইক্রোক্রেডিট শব্দ দুটি অনুরূপ হলেও একটি পার্থক্য আছে। মাইক্রোক্রেডিটের ভবিষ্যৎ কি বলে আপনি মনে করেন?

ড. মো. শহিদুজ্জামান : প্রথমত মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ এবং মাইক্রোক্রেডিট শব্দ দুটি আমরা প্রথম থেকেই ইউজ করি না। কারণ এই শব্দ দুটোর সাথে আমি কনসেপ্টচুয়ালি একমত না। আমরা একটা শব্দই ব্যবহার করি সেটি হলো মাইক্রোফিন্যান্স। কারণ এটিই সঠিক ফিন্যান্স। অর্থাৎ যার যে পরিমাণ ক্ষুদ্র অর্থায়নের প্রয়োজন পড়বে তার সাথে মিলিয়েই ফাইন্যান্স করতে হবে। কিন্তু যখন মাইক্রোক্রেডিট বা এনজিও বলবেন তখন তার একটা গ্রামার আছে। এটা একটা দীর্ঘ স্ট্রাকচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এগিয়েছে। আমরা মাইক্রোক্রেডিটের ফিলোসফিটা ধারণ করেছি একটু আলাদাভাবে। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, যখন প্রফেসর ড. মুহম্মদ ইউনূস মাইক্রোক্রেডিট শুরু করেছেন তাঁরও আগে রবীন্দ্রনাথ কোঅপারেটিভ করেন, ড. আখতার হামিদ খান কুমিল্লা মডেল করেছেন এগুলো আমরা জানি। মনে রাখতে হবে যে সেটি একটি 'ফিলিং দ্যা গ্যাপ' ছিল। তখন মানুষের প্রয়োজন ছিল কিন্তু হাতে টাকা ছিল না। দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে নারীরা টাকা চোখে দেখেনি। এই জায়গাটিতে বুরো বাংলাদেশসহ অনেকে একটা অসাধারণ কাজ করেছে। এর জন্য অবশ্যই তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। এটা বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষকে দারিদ্রতার যে ট্র্যাপ, প্রোডাক্টিভিটি সাইকেলের যে ব্যারিয়ারগুলো ছিল সেটি ভাঙার ব্যাপারে মাইক্রোক্রেডিটের ভূমিকা অসাধারণ।

দ্বিতীয়ত : মাইক্রোক্রেডিটের ভবিষ্যত। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে মার্কেট কিন্তু স্যাচুরেটেড। আপনি যদি এটিকে বিজনেস ক্লায়েন্ট অব সার্ভিস ফর্মুলা চিন্তা করেন, দেখবেন এনজিওরাই এক সময় এটির ফাইন্যান্সিং করতো। কিন্তু এখন ব্যাংকগুলোও মাইক্রোক্রেডিটে চলে গেছে। এবং এটি এতো গ্রাস রুট পর্যন্ত গেছে যে, আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশে এমন কোনো গ্রাম থাকবে না যেখানে কোনো না কোনো ব্যাংকিং সার্ভিস গিয়ে পৌঁছাবে না। সুতরাং আপনি যদি ট্রাডিশনাল মাইক্রোফিন্যান্স করেন বা মাইক্রোক্রেডিট করেন তাহলে আপনার জাস্টিফিকেশনটা আর থাকবে না। বিজনেস হিসেবে ঠিক আছে কিন্তু যে লজিক দিয়ে মাইক্রোক্রেডিটের জন্ম হয়েছিল– দরিদ্র মানুষের টাকা নেই, তাই আমরা অর্থায়ন করে তাদের পরিবর্তন আনতে চাচ্ছি। এটা যদি এনটাইটেলমেন্ট হয় তাহলে বলতে হবে যে এখন আর লোন দরকার হচ্ছে না কারণ, ফরমাল ব্যাংক এখন সে জায়গায় পৌঁছে গেছে। সুতরাং মাইক্রোফিন্যান্স যারা চালান, যে কর্তাব্যক্তিরা আছেন, পলিসি মেকাররা আছেন তাদেরকে চিন্তা করতে হবে ফিউচার কনটেস্টে আপনি এই চেঞ্জিং সিনারিওর সাথে যদি এডাপশন করতে না পারেন, তাহলে হয়তো হিউজ সারপ্লাস, হিউজ ক্যাপিটাল স্টান্ডিং থাকতে পারে। আমরা

এনজিওরা যতই দাবি করি আমরা মানুষের পরিবর্তন আনছি কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশে একটা স্ট্রং এলিট গ্রুপ আছে যাদের ধারনা আমরা বিজনেস করি। মাইক্রোফিন্যান্স একটা লেন্ডিংয়ের ব্যাপার, এটি মডার্নাইজ বিজনেস। আপনি যদি প্রফেসর ইউনূস সম্পর্কে ফেসবুকে ভালো একটি পোস্ট দেন দেখবেন অনেক খারাপ মন্তব্য নিচে লেখা হবে। তুলনামূলকভাবে যারা শিক্ষিত সচেতন তারাই লিখছে। প্রথমত আমরা গত ৩/৪ দশকে মানুষকে বা এই গ্রুপগুলোকে বুঝাতে সক্ষম হইনি যে আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষের ভালো করি। এটি আমাদের একটি চরম ব্যর্থতা। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে অধিকাংশ এনজিওর একটা স্কিপিং ক্যারেক্টার আছে। অর্থাৎ যত কম পারো এই সমস্ত লোকজনের সাথে মিশো না, সিভিল এলিটদের সাথে মেশার দরকার নেই, সরকারের সঙ্গ অ্যাভয়েড কর। কোনো প্রশ্ন আসলে হেড অফিসে যোগাযোগ করেন। এর ফলে আপনি আপনার শঙ্কাটা তৈরি করে দিচ্ছেন। বুরো বলেন, ব্র্যাক বলেন, আশা বলেন কিংবা ইএসডিও বলেন, তাদের প্রত্যেকটা পাই-পয়সার হিসাব আছে। তো স্বচ্ছ হিসাব থাকলে কাউকে শেয়ার করতে অসুবিধাটা কোথায়? আমরা তো এখান থেকে একটা পয়সাও লুটপাট করছি না। তাহলে আমাদের এই হাইডিংটা কেন?

এ দেশের এনজিওরা এত ভালো কাজ করার পরও সে কাজগুলোকে এক্সপোজ করতে পারেনি বা করতে চায়নি। আমি এর আগেও একাধিক জায়গায় বলেছি যে, আপনি কয়টি স্টাডি করেছেন, ইভ্যালুয়েশন করেছেন তাতে কিছু যায়-আসে না। ধরুন আমরা অর্থনীতিবিদদের ইংরেজি লেখায় ২০ পাতার পোর্টফোলিও বুরো বাংলাদেশ কিংবা ইএসডিওর জন্য করে রেখেছি তাতে সাধারণ লোকের কি যায় আসে?

প্রত্যয় : এনজিও সেক্টরের মুখপত্র প্রত্যয় কিংবা প্রত্যয়ের মতো ম্যাগাজিন দিয়ে এই সংকট আমরা কিভাবে মেটাতে পারি?

শহীদ উজ জামান : বাংলাদেশে গার্মেন্টস সেক্টর নিয়ে এত নেগেটিভি কথা আসে তারপরও সবাই দাঁড়িয়ে যায় যে, নারীর ক্ষমতায়নে গার্মেন্টস সেক্টরের ভূমিকা অসাধারণ। এটা তারা করতে পেরেছে নিজেদের মিডিয়ার কারণে। এখানে প্রত্যয় কেন– বুরো বাংলাদেশের টেলিভিশন

করার ক্যাপাসিটি আছে। এর মাধ্যমে এ খাতের পজেটিভ সাইটগুলো তারা দেখাতে পারে। এতে শুধু বুরো'রই উপকার হবে না, গোটা সেক্টর সম্পর্কে মানুষের যে অস্পষ্টতা আছে তা দূর হয়ে যাবে।

একটা জিনিস দেখেন আমরা যে রেট অব ইন্টারেস্ট কমিয়েছি এটার কোনো এক্সপোজার আছে? করোনাকালীন সময়ে কোনো কালেকশন নেয়া হয়নি, লক্ষ কোটি টাকা সেভিংস রিটার্ন করা হয়েছে, এনজিওরা নিজেদের রিজার্ভ থেকে ফান্ড দিয়েছে তার কোনো প্রচার নেই। অথচ ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রধানমন্ত্রীকে ১ কোটি টাকা দিয়েছে সেটার নিউজ অনেক টেলিভিশন এবং পত্রপত্রিকায় এসেছে। আমাদের নিউজগুলোও মিডিয়াতে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

প্রত্যয় : আমাদের দেশে যেমন গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আপনি কি মনে করেন আমাদের যে এনজিওদের সামর্থ আছে তাদের যৌথভাবে আরো ২/১টা ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক করা দরকার?

শহীদ উজ জামান : এ ব্যাপারে বহুদিন ধরে কথাবার্তা চলছে। আমার এ ব্যাপারে স্ট্রং রিজার্ভেশন আছে। আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, আজকে যারা এমএফআই তারা যখন এনজিও হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেছিল তখন তারা কিন্তু ব্যাংক করবে এই চিন্তা করে শুরু করেনি। তারা শুধু চেয়েছিল গরিব মানুষের ভালো করা। আমার একান্তই ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, আমি এই ব্যাংক করার পক্ষে না। আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম ক্রমশ সেখান থেকে সরে যাচ্ছি। আমরা গরিব মানুষের ভাল করতে চেয়েছিলাম। আপনারা ব্যাংকের কথা বলছেন, ব্যাংকে তো গরিব মানুষ এমনিতেই ঢুকতে পারে না। তাহলে আমরা কি পর্যায়ক্রমে গরিব মানুষদের থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছি না?

প্রত্যয় : এনজিও/এমএফআই হিসেবে ক্ষুদ্র অর্থায়নেও একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এতে সেভাবে উপকার করা যায় না। এই ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংকগুলো যদি দরিদ্রবান্ধব হয় এবং তারা যদি এখনকার মতো দারিদ্র্য নিরসনসহ প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে কাজ করে সেক্ষেত্রে আপনার মন্তব্য কি?

শহীদ উজ জামান : এটা যদি গরিব মানুষের জন্য এক্সিসিবল হয় তা হলে এটা ভালো। আমার পয়েন্ট হচ্ছে দুটো। প্রথমত, যে দর্শন নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হয়েছে সেই দর্শন থেকে ব্যাংকটা কাভার করবে কি না? যদি করে আমার কিছু বলার নেই।

বাংলাদেশে যারাই এনজিও করেছে সেটা ছোটভাবে হলেও তাদেরকে আমি স্যালুট করি। কারণ, সে আর্থিকভাবে বিশাল লাভবান হবে এই স্বপ্ন নিয়ে শুরু করেনি। তার জীবনের সবচেয়ে গোল্ডেন টাইমটা সে স্ট্রাগল করে পার করেছে। সে একটা ফিলিংস, একটা মটো, একটা ফিলোসফি নিয়ে শুরু করেছে। কিন্তু যখন কেউ তার এই ফিলোসফিটা রিকগনাইজ করে না তখন খুব কষ্ট লাগে।

এই দেশে এতো যে জাতীয় পুরস্কার আছে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের জন্য কি কোনো পুরস্কার আছে? এদেশে রপ্তানি ট্রফি, সিআইপি ট্রফি আরো কতো কিছু আছে কিন্তু এ খাতে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করছে আর কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছে এটাকে তো কেউ মূল্যায়নই করে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো স্বীকৃতিই নেই।

প্রত্যয় : বর্তমান বিশ্ব সাসটেইনেবল অর্থনীতির উপর জোর দিচ্ছে। বাংলাদেশে এসডিজিবিষয়ক যে অগ্রগতি একটা সম্প্রতি জাতিসংঘ থেকে বর্তমান সরকার একটা সম্মাননাও পেলো; আপনি কি মনে করেন এই সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট যে বাংলাদেশে হচ্ছে এর পেছনে এনজিও এবং এমএফআই খাতের ভূমিকা আছে?

শহীদ উজ জামান : তা তো অবশ্যই। শুধু এসডিজিই নয় এর আগে যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) হয়েছিল সেখানেও বাংলাদেশ গ্লোবালি ভালো করেছিল এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ থেকে এমডিজি বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। সেখানে এনজিওগুলোর ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। যে সকল জায়গায় এনজিওরা কাজ করেছে সে সকল জায়গায় এই জিনিসগুলো ভালোভাবে এসেছে। এসডিজি'র ১৭টা পয়েন্টের ১৬টার মধ্যেই এনজিওগুলোর ব্যাপক যুক্ততা আছে। সবচেয়ে বড় কথা, ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে এনজিওদের রিকগনাইজ করা। কিন্তু এর পেছনে এনজিওদের অবদান শুধু যে অপরিহার্য তা নয়, দরকার এটাকে ধরে রাখা, কন্টিনিউশন করা।

এমনি এমনি কি পোভার্টি কমে গেছে। তখন যে এক্সট্রিম পোভার্টি ছিল, এখন বাংলাদেশের যে সকল জায়গায় সিভিয়ার পোভার্টি যেমন কুড়িগ্রাম, সেখানে কি এমন কাউকে পাওয়া যাবে যে যারা এক বেলা না খেয়ে আছে? এই জায়গাগুলোতে এনজিওরা ব্যাপক কাজ করেছে। যে সকল জায়গাতে বাংলাদেশ ভালো করতে পারেনি সে সকল জায়গায় এনজিওদের ভূমিকা কম বা সুযোগ কম ছিল সেজন্য পারেনি। উদাহরণ হিসেবে বলি, আমাদের দেশে এখন ডেসপারিটি বাড়ছে, জিডিপি বাড়ছে কিন্তু গ্রস জিডিপি বাড়ার সাথে সাথে যে ডিসক্রিমিনেশন, ডেসপারিটি বাড়ছে এখানে সরকারকে কাজ করতে হবে। আমরা পলিসি অ্যাডভোকেসি করতে পারি কিন্তু ডিরেক্টলি ইন্টারভেইন করতে পারি না। তো যে জায়গায় এনজিও এমএফআইরা কাজ করেছে

সেখানে এসডিজি সাফল্য পেয়েছে।

প্রত্যয় : আপনারা নদী নিয়ে কাজ করছেন, নদীর গতি-প্রকৃতি পরিবর্তন, জলবায়ুর পরিবর্তন এই বিষয়টি আপনি চর্চা করছেন, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে সরকারের প্রতি আপনার পরামর্শ কি?

শহীদ উজ জামান : বাংলাদেশে এক্ষেত্রে দুটি কাজ হয়েছে। এক হচ্ছে মহামান্য হাই কোর্টের রায়। সেখানে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে বিবেচিত করিতে হইবে।' যার ফলেই বুড়িগঙ্গার দুই তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম চলছে এবং এই রায়ে মহামান্য হাই কোর্ট সরকারকে বলেছেন নদী কমিশন গঠন করার জন্য। ফলে একটি নদী কমিশন গঠিত হয়েছে এবং এর অধীনে জেলা-উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নদী কমিটি হয়েছে। এটি একটি ইউনিক কাজ হয়েছে। বিতর্ক থাকতে পারে যে কোন কমিটি কত বেশি বা কম কাজ করেছে কিন্তু এটাকে ফর্মালি অ্যালাউ করা, নদীর তথ্য উপাত্ত রাখা এবং নদীকেন্দ্রিক সরকারি কমিশনকে দিয়ে কাজ করানো– এই নদী কমিশনের আমি একজন এক্সপার্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ। এখানে কিছু কাজ হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে কিছু ক্রাইসিস আছে, যে কাজটা ইউনিক হয়েছে, সরকার পুরোপুরি করতে না পারলেও তালিকা করেছে– সেটা হচ্ছে সারাদেশে কে কোথায় নদী দখল করেছে। এই অসাধারণ কাজের জন্য সরকারের ধন্যবাদ পাওয়া উচিৎ। সরকার এ ব্যাপারে একটি যথার্থ তালিকা করেছে।

প্রত্যয় : টাঙ্গন এবং কুরি নদী। এখানে কি কোনো দখল উচ্ছেদ করেছেন?

শহীদ উজ জামান : এখানেও আমরা বেশ কিছু দখল উচ্ছেদ করেছি। আমাদের এই জেলায় প্রায় ৬ হাজার ৬শ' জন ১৮ থেকে ২৫ বছরের তরুণ আছে। এদেরকে সাথে নিয়ে আমাদের একটি ক্যাম্পেইন আছে। এই ক্যাম্পেইনের নাম হচ্ছে টাঙ্গন বাঁচাও, কুরি বাঁচাও। দেশ এবং দেশের বাইরের লোকজনও এই ক্যাম্পেইনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এই ৬ হাজার ৬শ' যুবক সকল জেলায় প্রত্যেকটা নদীর তথ্য-উপাত্ত সব তালিকা করেছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় ইউএনও এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়ে উচ্ছেদ কার্যক্রমও চালিয়েছে।

প্রত্যয় : ইকো পাঠশালা নিয়ে জানতে চাচ্ছি।

শহীদ উজ জামান : দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা নন-ফরমাল স্কুল চালাতাম। ESDO ১৯৯৭ সালে বেস্ট নন-ফরমাল এডুকেশন সেক্টর হিসেবে রাষ্ট্রীয় পদকও পেয়েছে। তখন একটি ভালো মানের স্কুল করার চিন্তা করে ২০০১ সালে ছোট আকারে শুরু করি। তখন আমাদের প্ল্যান ছিল একটি বছর যাবে আর একটি করে ক্লাস বাড়তে থাকবে। এখন এখানে এইচএসসি পর্যন্ত পড়ানো হয়। এইচএসসির পরে আমরা স্কুলটা রান করাই না। আমাদের মূল ট্যাগলাইন ছিল 'আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগড়'। এই স্কুলের সিস্টেমটা হচ্ছে অ্যাবসুলেটলি একটা পেইডিস্ট। যারা পড়বে তাদেরকে পয়সা দিয়ে পড়তে হবে। দরিদ্র ছেলেমেয়েরা পয়সা দেবে না। কিন্তু ESDO তাদের পয়সাটা দিয়ে দেয়। স্কুলের কন্ডিশন হচ্ছে এটি বিনে পয়সায় চলবে না। যদি লং টাইম সাসটেইনেবিলিটিতে যেতে হয় তবে তার জন্য কোয়ালিটি শিক্ষক রাখতে হয়। ইক্যুইপমেন্ট রাখতে হয়, ইনস্ট্রাক্টর রাখতে হয় তাহলে এটিকে অবশ্যই পেইডিস্ট হতে হবে। এখানে প্লে তে যে বাচ্চা পড়ে তারও বেতন ১ হাজার টাক আবার এইচএসসিতে যে বাচ্চা বড়ে তার বেতনও ১ হাজার টাকা।

মূল বিষয় হচ্ছে যারা মিসিং মিডেল ক্লাস আছে এবং মাঝখানে যে সিভিল সোসাইটি তারা এগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা পায় না। এটি করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের ছেলেমেয়েরা তো এখানে পড়বে এবং তাদের গার্ডিয়ানরা এখানে আসবে এবং ESDO সম্পর্কে একটি ধারনা পাবে। ESDO কে পুরো ঠাকুরগাঁওয়ে কেউ মাইক্রোফিন্যান্স ইনস্টিটিউট বলে না– তারা এটিকে চিনে এই জেলার ডেভেলপার হিসেবে। স্কুল করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ভালো শিক্ষা দেবো। দ্বিতীয় হচ্ছে নৈতিক শিক্ষাটাও ভালো দেবো। তৃতীয় হচ্ছে যে আমরা তাদের মাইন্ড সেটআপকে এমনভাবে ডেভেলপ করবো যে যেই ছেলে এখান থেকে পাস করে বের হবে সে যেন একজন অ্যাকাউন্টেবল সিটিজেন হিসেবে তৈরি হয়। এবং ভবিষ্যতে সে যখন চাকরি বা ব্যবসা বা যা কিছুই করুক মানুষের উপকার ছাড়া ক্ষতি যাতে সে না করে। রবীন্দ্রনাথের একটি শিক্ষার দর্শন আছে সেটি হচ্ছে– 'শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিৎ যেটি মানুষকে মুগ্ধ করবে না বরং মুক্তি দান করবে'।

প্রত্যয় : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক অর্থাৎ ক্যাডার সৃষ্টি করা।

শহীদ উজ জামান : এ সরকারের শিক্ষা নীতিটা খুব পজেটিভ। এইচএসসি'র আগে সায়েন্স, আর্টস, কমার্স থাকবে না। এটি খুব ভালো সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশে ইয়থদের জন্য যে কারিগরি শিক্ষা এই মুহূর্তে ESDO হচ্ছে সেই অঙ্গনে থার্ড লার্জেস্ট। প্রতি বছর আমরা প্রায় ১০ হাজার ছেলেমেয়েকে গ্র্যাজুয়েট করি যারা শ্রমবাজারে জয়েন করে। আমাদের অনেক জায়গায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। আমরা প্রায় ২২টি ট্রেডে ছেলে মেয়েদের ট্রেনিং করাচ্ছি। যেগুলো কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্টার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন (RTO) দ্বারা নির্বাচিত করা। এদের ভিতর আমরা ২০ জনকে মাইক্রোফিন্যান্সিং দিয়ে ছোট ছোট বিজনেজ করার জন্য সাহায্য করছি। আমাদের ইচ্ছা আছে একটা বিশ্ববিদ্যালয় করার এবং আমরা কোনো ভাড়াটিয়া বিশ্ববিদ্যালয় করবো না। আমরা একটা রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি করবো উইথ ন্যাচার। আমার ইচ্ছা হলো বয়স যখন ৬০ হবে তখন আমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করবো। ESDO অন্য কেউ চালাবে।■

জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োজন সম্পদের সুষম বন্টন

শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (CDA)

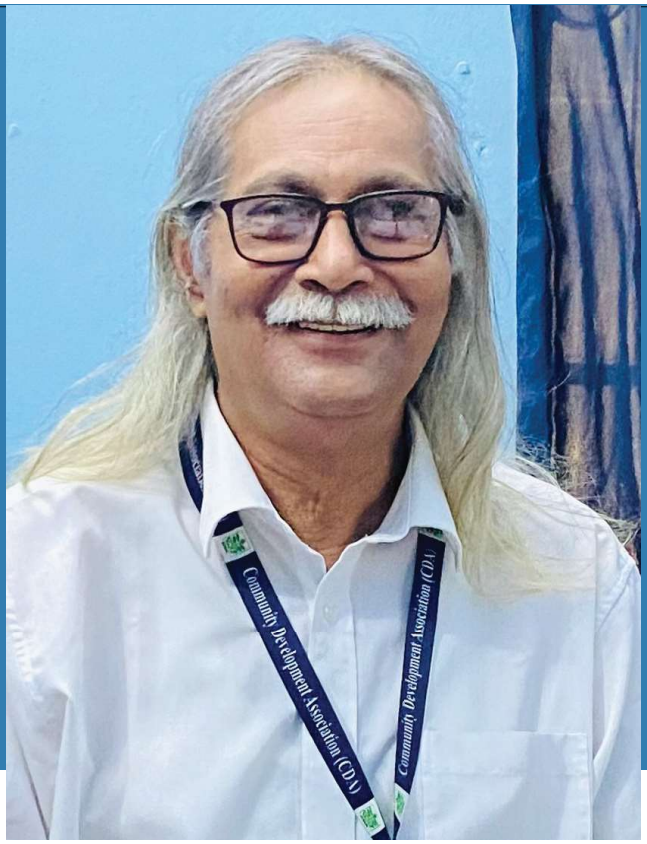

বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (CDA) এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্ এর জন্ম ১৯৫০ সালে দিনাজপুরের শ্রীবন্দর থানাধীন গোলবাহার গ্রামে। পিতা মরহুম শাহ্ মো. মোফাখ্খার হোসেন, মা মরহুমা মুইনা বেগম। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মেধাবী জিন্নাহ্ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিএড ডিগ্রিও অর্জন করেন। অধ্যয়ন শেষে তিনি ৫/৬ বছর একটি উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে কানাডিয়ান একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ৫ বছর সমাজকল্যাণমূলক কর্মের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ছোট বেলা থেকেই সমাজ ব্যবস্থার চারপাশের চিত্র তাকে বেশ নাড়া দিত। বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের দুঃখ কষ্ট কান্না তাকে ভাবিত করতো। তিনি মনে করতেন, এই সামাজিক বৈষম্যের অবসান হওয়া প্রয়োজন। সমাজ বিজ্ঞানে পড়ার সুবাদে তিনি এ বিষয়গুলোতে আরও ধাতস্ত হওয়ার সুযোগ পান। এক পর্যায়ে ১৯৮৫-৮৬ সালে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন, বৈষম্যের অবসান ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে তোলেন সিডিএ। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শাহ্-ই-মবিন জিন্নাহ্ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি এফএনবি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ক্যাম্পে ও এএলআরডির সদস্য। তিনি আন্তর্জাতিক এশিয়ান এনজিও কোয়ালিশন, ইন্টারন্যাশনাল ল্যান্ড কোয়ালিশন– রোম ও ওয়ার্ল্ড রুরাল ফোরাম– ফ্রান্স এর সদস্য। তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য এবং আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি উদ্ধারের নীতি নির্ধারণী পরিষদের সাত সদস্যের একজন।

দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্'র দুই সন্তানের মধ্যে মেয়ে চিকিৎসক এবং ছেলে অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। সমাজ বিশ্লেষক ও উন্নয়ন কর্মে নিবেদিত প্রাণ এনজিও ব্যক্তিত্ব সিডিএ এর নির্বাহী পরিচালক শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্ প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্যয় : আপনি দেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (সিডিএ) এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ও একজন সমাজ বিশ্লেষক। সিডিএ প্রতিষ্ঠার পেছনে কোন বিষয়টি আপনাকে নাড়া দিয়েছে?

শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্ : বাংলাদেশের এই অঞ্চলটি ছিল সামন্ত অঞ্চল। সামন্ত জমিদাররাই ছিলেন এখানকার ৯৫% জমির মালিক। পাকিস্তান হবার পর এই মালিকানা চলে যায় জোতদারদের হাতে। এখানকার ১২০০ বছরের ইতিহাসে বেশ ক'বার নিজেদের অধিকার আদায়ে প্রজা বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে। এমনি একটি সামন্ত নির্ভর পশ্চাদপদ অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের পরও সাধারণ মানুষ ভূমির মালিকানাসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বিশেষ করে ভূমিহীন দরিদ্র-হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যার অন্ত ছিল না। এরই প্রেক্ষিতে আমরা ১৯৮৫-৮৬ সালে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে বিশেষ করে তাদেরকে অনাহার, বৈষম্য, শোষণ-বঞ্চনা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই সিডিএ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেই।

এছাড়া দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহ খরাকবলিত এবং নদী ভাঙনের ফলে অসংখ্য মানুষই ভিটেমাটি হারা। এখানে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। শ্রম মজুরিও কম। ফলে এসব মানুষ খাদ্য স্বল্পতা ও অসুস্থতায় ভোগে। এ অবস্থার উন্নয়নের জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ।

প্রত্যয় : ৭১ সালে মানুষ স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মানুষের প্রত্যাশা ছিল স্বাধীনতা অর্জিত হলে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন মানের উন্নয়নসহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হবে। আপনার মূল্যায়ন কি?

শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্ : একটি দেশের মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করেই হয় না। এটি দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল। আমি আগেই বলেছি, এ অঞ্চলের মানুষ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য শত বছর ধরে আন্দোলন-লড়াই করে আসছে।

১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেলো– মানুষ ভেবেছিল তাদের খাওয়া-পরায় সমস্যা থাকবে না। তাদের অধিকার বঞ্চিত থাকতে হবে না। কিন্তু তাদের সেই আশা পূরণ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষ মনে করেছে আমাদের একটা নতুন দেশ হবে, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনা থাকবে না। সম্পদের সুষম বন্টন হবে, মানুষের মধ্যে সমতা-সাম্য বজায় থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কিন্তু এটাই ছিল– কিন্তু বাস্তবে দেশে একদিকে কিছু মানুষ হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে, সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে; অন্যদিকে অনেক মানুষ অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মানবেতর জীবন যাপন করছে।

আমরা অনেকেই রাজনৈতিক সুবিধা নেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের পক্ষে কথা বললেও প্রকৃত অর্থে যে চিন্তা চেতনার আলোকে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যে স্বপ্ন নিয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে নির্ভিকভাবে রক্ত দিয়েছে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেনি।

প্রত্যয় : আপনি বলছেন তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। দেশব্যাপী এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে আপনার প্রস্তাবনা কি?

শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্ : যে কোনো কাজের জন্যই নেতৃত্ব একটি বড় বিষয়। আমরা সমাজ পরিবর্তনের যে উদ্যোগ নিয়েছি তাতে তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ প্রয়োজন। আমি মনে করি এ জন্য দেশের বেসরকারি সকল উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর এগিয়ে আসা উচিত।

প্রত্যয়: আপনারা ভূমিহীনদের অধিকার আদায়ে কাজ করছেন। আপনার জানা মতে, রংপুর বিভাগের কত ভাগ মানুষ ভূমিহীন বলবেন কি?

শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্ : ভূমির অধিকার বলতে শুধু মাটির উপরে নয়, মাটির নিচের অধিকারকেও বুঝায়। আমাদের রংপুর বিভাগে ৬৯% এর বেশি মানুষই ভূমিহীন। আর যে ৩১% মানুষের জমি রয়েছে তাদের মধ্যে ৭০% জমির মালিকই মাত্র ১০%। দেশের সার্বিক অর্থনীতির কথা বাদই দিলাম, কৃষি খাতেও একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজমান। ভূমিহীনরা কেউ অন্যের জমি চাষ করেন, কেউ আবার কাজের সন্ধানে হয়ে গেছেন গ্রামছাড়া। এ ছাড়া এ অঞ্চলে বসবাসকারী নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী শুধু ভূমি অধিকার থেকেই বঞ্চিত নয়, নানাভাবেই নির্যাতীত ও অবহেলিত।

প্রত্যয়: আপনাদের সিডিএ-এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলবেন কি?

শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্ : দেখুন, আমরা এ দেশের ভাগ্যহীন, বঞ্চিত, দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিন্তা থেকেই সিডিএ প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিকভাবে বৈষম্যমুক্ত ন্যায্য একটি সমাজ যা জনকেন্দ্রিক গণতন্ত্র ও সুশাসনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতাহীন, গ্রামীণ দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দ্বারা তাদের জনসংগঠন নির্মাণ করা। এই কাজের মধ্য দিয়ে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে যেমন জনসচেতনতা সৃষ্টি করছি, তেমনই সংগঠন ও নেতৃত্বও গড়ে তুলছি। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি এবং স্যানিটেশন, পরিবেশ ও টেকসই ভূমি ব্যবহারে কাজ করছি। শিক্ষা বিস্তার ও মানব সম্পদ উত্তরণেও আমাদের জোরালো ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ নিয়েও আমরা কাজ করছি।

তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মে নিয়োজিত করার ব্যাপারেও আমরা সক্রিয় রয়েছি।

প্রত্যয় : আপনারা দাতা সংস্থার মাধ্যমে 'সাসটেইনেবল অর্গানাইজেশন ফর ল্যান্ড রাইটস অ্যান্ড এগ্রেরিয়ান রিফর্ম চালু করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষ কিভাবে উপকৃত হচ্ছে?

শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্ : ভূমির উপর অধিকার মানুষের জন্মগত। ভূমির সাথে মানুষের সম্পর্ক জীবিকার, পরিচিতির এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির। এই ভূমিই মানুষকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মানসিকতা ও ঐতিহ্যের স্ফূরণ ঘটাতে সহায়তা করে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় যে, আমাদের এই উত্তর বঙ্গের বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুরের অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে ভূমিহীন ও দরিদ্র। তাদেরকে দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্য যে পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হয় সেক্ষেত্রে নিজেদের মানবাধিকার নিয়ে ভাবার সময় কোথায়? দেশে বিশেষ করে এ অঞ্চলে প্রচুর খাস জমি রয়েছে যা বিত্তবান ভূ-স্বামীরাই ভোগ দখল করে আসছে। সিডিএ-এর মাধ্যমে সেই সব জমির রিফর্মের জন্য বলতে পারেন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা চাই এসব জমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হোক। এতে করে দুটো গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সম্ভব হবে। একটি হচ্ছে ভূমির পূর্ণ ব্যবহার এবং ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের ভূমির অধিকার ফিরে পাবে। এখন যারা এসব ভূমি দখল করে আছে তারা কিন্তু তা পরিপূর্ণ ব্যবহার করে উৎপাদন করছে না।

সিডিএ এর পক্ষ থেকে আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে বারবার এ নিয়ে আলোচনা করছি। যদিও সরকারের নিকট খাসজমির তালিকা রয়েছে তবু আমরাও খাস জমি চিহ্নিত করে তাদের কাছে তা ভূমিহীন দরিদ্রদের মাঝে বিতরণের দাবি জানাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা না বললেই নয়, দেশে এই যে মামলার আধিক্য তার প্রায় ৮০ ভাগই জমির মালিকানা নিয়ে এবং মারামারি ও খুনোখুনির ঘটনাও এই ভূমিকে কেন্দ্র করেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষ অর্থাভাবে মামলাও লড়তে পারে না। ফলে তাকে ভূমির দখল হারাতে হয়। এসব ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করছি। আমরা তাদের লিগ্যাল অ্যাকশন নেয়ার ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করি যদিও কাজটি জটিল। ইতোমধ্যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছি।

প্রত্যয় : আপনারা ভূমিহীনদের সংগঠিত করার ব্যাপারে কতোটা সফল হয়েছেন?

শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্ : একটা বিষয় বলতেই হয় যে, আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ভূমিহীনদের সংগঠিত করেছি, তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। এখন বিভিন্ন উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ের ভূমিহীনরা সংগঠিত হচ্ছে এবং অধিকার আদায়ে সোচ্চার হচ্ছে। আমরা সরকারের কাছ থেকে সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি লিজ নিয়েও ঐক্যবদ্ধভাবে ফসল উৎপাদন করে সুফল পাচ্ছি। ইতোমধ্যে অনেক যুদ্ধ সংগ্রাম করে ৭০টি ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি উদ্ধার করে বসত বাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছি। আমরা বঞ্চিত হতদরিদ্র পরিবারের বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি কার্ড, ভিজিএফ কার্ড সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ব্যাপারেও সক্রিয় রয়েছি। আমরা চাই সম্পদের সুষম বন্টন এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা। এটা করতে হলে জনসংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আমরা আশ্রয়হীন অথাৎ মানুষের জন্য বসতভিটা এবং কৃষি জমির জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত পেতে সরকারের নিকট আবেদনপত্র দেই এবং তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখছি।

প্রত্যয় : এনজিও কার্যক্রমের পাশাপাশি আপনারা ক্ষুদ্র অর্থায়নও করে থাকেন। এক্ষেত্রে আপনারা কোন কোন খাতে ঋণ প্রদান করছেন। আপনি কি মনে করেন দেশের তৃণমূল মানুষের উন্নয়নে সক্ষম এমএফআইদের দ্বারা দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন?

শাহ্-ই-মবিন-জিন্নাহ্ : আমি মনে করি এনজিও এবং এমএফআইরা এ দেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেক্ষেত্রে সক্ষম এমএফআইদের দ্বারা ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে তৃণমূল পর্যায়ের এসব মানুষ আরো উপকৃত হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এসব ব্যাংকগুলোকে গতানুগতিক ধনীক শ্রেণির ব্যাংক হিসেবে পরিণত করা যাবে না। এসব ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম হবে দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য।■

দিনাজপুরের আলোহা কাজ করছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কমন জেন্ডার নিয়ে

ক্ষুদ্র বীজ থেকে জন্ম নেয়া চারা যেমন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়, ফল দেয়, ছায়া দেয় তেমনই একটি পরিবারের ভাই বোন ও পিতা-মাতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সমাজকল্যাণমূলক ট্রাস্ট আজ দিনাজপুরের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিত এনজিওদের একটি 'আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ' (ASSB)। আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ (এএসএসবি) এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৮ সাল। আলোহা মানে স্বাগতম, এটি একটি হাওয়াইয়ান শব্দ। এর নির্বাহী পরিচালক মিনারা বেগম। শুরুতে এটি তাঁর পাঁচ বোন, দুই ভাই, পাঁচ বোনের স্বামী এবং তাঁদের বাবা-মা মোহাম্মদ আলী ও ফয়জুন্নেসা দ্বারা গঠিত একটি ট্রাস্ট হিসেবে চালু হয়েছিল তাদের দিনাজপুরের বাসায়– নাম ছিল মোহাম্মদ আলী অ্যান্ড ফয়জুন্নেছা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট (MAFTA)। পরবর্তীকালে তারা ট্রাস্ট হিসেবেই দিনাজপুরের মোবারকপুরে এবং নওগাঁ জেলার পাঠানতলা উপজেলায় আঞ্চলিক অফিস চালু করে। ট্রাস্ট এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্রদের প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করে। ট্রাস্টের কল্যাণমুখী কার্যক্রমের সফলতা দেখে যুক্তরাষ্ট্রের Aloha Medical Mission in Hawaii তাদের সাথে যুক্ত হয়ে এর কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করে। এএসএসবি এনজিও ব্যুরো, এমআরএ এবং সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের নিবন্ধন গ্রহণ করেছে। বর্তমানে আলোহা দিনাজপুর, জয়পুরহাট ও নওগাঁর ১৫০০০ দুস্থ ও অসহায় পরিবারকে দুটি হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা সহায়তা দিচ্ছে। এ ছাড়া আলোহা তাদের প্রতিষ্ঠিত দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দিনাজপুরের আলী মঞ্জিল এখন বাতিঘর

দিনাজপুর শহরের বালুগাড়ির আলী মঞ্জিল এক সময় ছিল শুধুমাত্র একটা বাড়ি। সেই বাড়িটি এখন আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ (ASSB) এর মাধ্যমে হয়ে উঠেছে দিনাজপুরের গরিব ও হতদরিদ্র মানুষদের জন্য উন্নয়ন, সেবা ও আশ্রয়ের এক বাতিঘর। এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক মিনারা বেগম তাদের কাছে জননী স্বরূপ।

মোবারকপুর ট্রেনিং সেন্টার

আলোহা বিশ্বাস করে দক্ষতা একজন মানুষের আয়কে বৃদ্ধি করতে সক্ষম। এ জন্য আলোহা মোবারকপুরে একটি ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিবার ৪০ জনকে এখানে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুযোগ রয়েছে। এই সেন্টারে এয়ার কন্ডিশন, কম্পিউটার এবং মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর, হোয়াইট বোর্ড, ভিআইপিপি বোর্ড, সাউন্ড সিস্টেম, প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিল, মেয়েদের জন্য আলাদা বাথরুম এবং ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ (জেনারেটরসহ) এর ব্যবস্থা রয়েছে। এই ট্রেনিং সেন্টারে শুধু নিজেদের কর্মীদেরই প্রশিক্ষণ নয়, বাইরের প্রতিষ্ঠানকেও ভাড়া দেয়া হয়।

আপন ঠিকানা

আলোহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হচ্ছে দিনাজপুরের আশ্রয়হীন প্রান্তিক ও স্বল্প আয়ের মানুষদের নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা করে দেয়া। প্রাথমিক পর্যায়ে আলোহা ১২৫টি দরিদ্র পরিবারকে নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যারা এক সময় ছিল গৃহহীন তারা এখন এ শহরে বাড়ির মালিক হবার সুযোগ পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে Shanti Germany BM এর সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। আপন ঠিকানার বাসিন্দারা নিজেদের বাড়ি পেয়ে মহাখুশি। এদের একজন আলতা বানু জানান, আমরা রেল লাইনের পাশে ছাপড়া করেছিলাম। সরকার ভেঙে দিলে আমরা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ি। সে সময় মিনারা আপা আমাদের শুধু আশ্রয় নয়, নিজস্ব বাড়ির মালিক হবার সুযোগ দিয়েছেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আলোহা

আলোহা শিক্ষা প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রথমে দিনাজপুরের বালুবাড়ির নাসির নগরে মোহাম্মদ আলী অ্যান্ড ফয়জুন্নেছা মেমোরিয়াল প্রি-প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০১ সালে নাসির নগরে নার্সারি স্কুল এবং নওগাঁর মোবারকপুরে প্রি স্কুল শুরু করা হয়। এরপর জুনিয়র হাই স্কুল এবং ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে রামনগরে মোহাম্মদ আলী অ্যান্ড ফয়জুন্নেছা মেমোরিয়াল হাই স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। পত্নীতলার মোবারকপুরেও একই নামে শুরু করা বিদ্যালয়টি এখন হাই স্কুল হিসেবে উন্নীত হয়েছে। ভালো পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনায় এ স্কুল দুটোর শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আলোহা

আলোহা ১৯৯৮ সালে দিনাজপুরে হেলথ সার্ভিসের কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে বস্তিবাসী ও শহরতলীল গ্রামগুলোর মানুষদের জন্য আলোহা এই স্বাস্থ্যসেবা চালু করে। ধীরে ধীরে এই কার্যক্রম ব্যাপক উন্নত হয়েছে। বর্তমানে আলোহা দিনাজপুর শহরের বালুবাড়িতে এবং নওগাঁর পত্নীতলার মোবারকপুরে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। এ হাসপাতাল দুটিতে স্বল্প মূল্যে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের চিকিৎসা

সুবিধা প্রদান করা হয়। বছরে একবার জার্মান এবং আমেরিকার ডাক্তারদের টিম কয়েক সপ্তাহের জন্য এ হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করেন।

এ হাসপাতাল দুটিতে মেটারনিটি সার্ভিস, চক্ষু ও দাঁতের চিকিৎসাসহ সার্জিক্যাল ব্যবস্থা রয়েছে। গরিব রোগীদের ফ্রি চিকিৎসাসহ তাদের বিনামূল্যে ১ মাসের ওষুধ ও অতি দরিদ্রদের যাতায়াত ভাতাও প্রদান করা হয়। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এটি ১৪ বেডের হাসপাতাল। এখানে এখন দিনাজপুরের বাইরের রোগীরাও আসেন।

নারীর ক্ষমতায়নে আলোহা

আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী অধিকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কার্যক্রম-সভা-সেমিনার এবং আলোচনার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের সমতা, বাল্য বিবাহ রোধ, নারীদের আর্থিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা ও পরিবারে মানসম্মত খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। সামাজিক নানা বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতেও কাজ করছে।

ভোকেশনাল ট্রেনিং

আলোহা ইতোমধ্যে ১৫০ জন নারীর ৬০ জনকে পোলট্রি অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন, ৬০ জনকে পশুপালন এবং ৩০ জনকে টেইলরিং বা সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী বা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। তাদের এই প্রকল্প অব্যাহত রয়েছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়নে আলোহা

আলোহা উত্তরবঙ্গের ৩ জেলার ৯টি উপজেলায় ১১টি শাখার মাধ্যমে ২০১৭ সাল থেকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম চালু করেছে। ভূমিহীন, বিধবা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেয়া হয়। আলোহার ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে অনেক পরিবার আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। আলোহার সদস্য সংখ্যা ১৩ হাজার ৭৩৮ জন এবং উপকারভোগীর সংখ্যা আনুমানিক ৬৫ হাজার ৬৪২ জন। তাদের দেয়া ঋণের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৯৪ লাখ ৯৯ হাজার ৭০০ টাকা এবং সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫ কোটি ৫৬ লাখ ৯৪ হাজার ৬২০ টাকা। আদায়ের হার ৯৬%।

কমন জেন্ডারদের জন্য আলোহা

আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রমধর্মী কাজ হচ্ছে কমন জেন্ডারদের সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ। আলোহা প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৪০ জনের মতো তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে তাদের পরিবার পরিজনদের সাথে থাকার ব্যবস্থা করেছে, তাদের বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এক সময় যারা রাস্তাঘাটে মানুষের ওপর চড়াও হয়ে 'জোরপূর্বক ভিক্ষা বৃত্তি'র সাথে সম্পৃক্ত ছিল–যারা সমাজের মূল ধারা বিশেষ করে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল তারা এখন পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন।

এদের কেউ শিক্ষক, কেউ কেউ আলোহা থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে গরু, হাঁস-মুরগী পালন করছেন। গরুর দুধ বিক্রি কিংবা অন্য আয় থেকে দিচ্ছেন কিস্তি। মা-বাবাকে টাকা দিচ্ছেন, ভাই-বোনকে পড়াশোনা করাচ্ছেন। সর্বোপরি তারা যে এই সমাজেরই বাসিন্দা তাদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে আলোহা।

কমন জেন্ডারদের সাথে কথোপকথন

আমরা কথা বলি কমন জেন্ডারদের বেশ ক'জনের সাথে। এদের মধ্যে একজন বিশ্বজিত চক্রবর্তী। তিনি শিক্ষিত। বাফা থেকে নাচ শিখেছেন। এখন একটি স্কুলের নাচের শিক্ষক। আলোহার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও নির্বাহী পরিচালক মিনারা বেগম তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। তিনি জানান, স্টুডেন্টরা তাকে খুব ভালোবাসে। তিনি সৃজনশীল নৃত্য শিখিয়ে থাকেন। তিনি তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করছেন। তিনি আরো বলেন, আলোহা শুধু সংগঠন নয়, এটা একটা পরিবার– এখানে কেউ কাউকে ছোট করে দেখে না।

ফয়সাল আলী নিশি– তিনি আলোহা থেকে ঋণ নিয়ে গরু ক্রয় করেছেন। তিনি বলেন, এখন আর কারো কাছে হাত পাততে হয় না। স্বাবলম্বী হয়ে নিজেকে গর্বিত মনে হয়। সদস্য রফিক ওরফে জাহানারা শহরতলীর মানবপল্লীর বাসিন্দা। তিনিও গরু পালন করেন, তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছি। অজিত রায় রজনীও মানবপল্লীতে থাকেন। তিনি তাদের সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ। তিনি এখন মায়ের সাথে থাকেন। তিনিও গরু পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। গরু ছাড়াও তাঁর পরিবারে ৭টি হাঁস ও ১৭টি মুরগী আছে।

তাঁরা প্রত্যেকেই বলেন, আগেকার জীবন ছিল ঘৃণিত, এখন তা মর্যাদার হয়েছে এবং এসবই সম্ভব হয়েছে আলোহার উদ্যোগের ফলে। তারা আরো বলেন, আলোহা তাদের প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে তাদের আচার আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তাদের কম্পিউটার ট্রেনিং, গরু ছাগল, হাঁস-মুরগী পালনে দক্ষ করেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই সেলাই মেশিন ও মনোহারি দোকানও দিয়েছে। তারা এখন আর জনবিচ্ছিন্ন নন, তারা এখন অর্থনৈতিক শক্তি ■

এনজিওরা তৃণমূল পর্যায়ে স্থায়ী উন্নয়ন করছে

মিনারা বেগম
নির্বাহী পরিচালক
আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ (ASSB)

এ সময়ের এক আলোকিত উন্নয়ন নারী ব্যক্তিত্ব মিনারা বেগম। তিনি উত্তরবঙ্গের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ (ASSB) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং নির্বাহী পরিচালক। মিনারা বেগমের জন্ম দিনাজপুরের বালুবাড়ির এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষিত ও সমাজসেবা সংশ্লিষ্ট পরিবারে। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবক। মা মরহুম আলহাজ্ব ফয়জুন্নেছা। মিনারা বেগমের স্বামী মো. নুরুল মঈন মিনু একজন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা এবং দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি। ছোটবেলা থেকেই উদ্যমী ও সমাজসেবা মনোভাবাপন্ন মিনারা বেগম বিয়ের পরও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম ও পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

আত্মপ্রত্যয়ী মিনারা বেগমরা ৫ বোন ও ২ ভাই। মিনারা বেগম সবার ছোট। তার দুই ছেলে ইমরোজ মঈন ও নওরোজ মঈন বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী, দু'জনই ইঞ্জিনিয়ার। ছোট বেলা থেকেই মিনারা বেগম সমাজসেবা কাজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি দেখেছেন তার মা-বাবা যখনই কোনো মানুষের সমস্যার কথা শুনেছেন তখনই সেই অসহায় মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে গিয়েছেন।

১৯৯৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর মায়ের মৃত্যু বার্ষিকীর দিনে বাবা ও সব ভাই বোন একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ (এএসএসবি) নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠার। এই প্রেক্ষাপটেই মায়ের মৃত্যু বার্ষিকীতে এএসএসবি সংগঠনটির যাত্রা। শুরু থেকে অদ্যাবধি তিনি সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, এএসএসবি এর প্রেসিডেন্ট আরজুনা বেগম। ইসি সদস্যরা হচ্ছেন– ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস রুবাইয়াত হোসেন, জেনারেল সেক্রেটারি মিনারা বেগম, কোষাধ্যক্ষ রওশন আরা মিজান, সদস্য– মিসেস মাজেদা হোসেন, লাভলী বেগম, ফিরোজা বেগম, জেরিন আক্তার এবং জুলেখা হোসেন। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এএসএসবি'র নির্বাহী পরিচালক উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব মিনারা বেগম যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো :

প্রত্যয় : মূলত আলোহা শুরু হয়েছিল একটি পারিবারিক ট্রাস্ট এর মাধ্যমে। পরবর্তীতে এটি আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ (এএসএসবি) এনজিও হিসেবে রূপান্তরিত হয়। এই উত্তরণের গল্প শুনতে চাচ্ছি–

মিনারা বেগম : এটি ছিল আমাদের একটি পারিবারিক ট্রাস্ট। আমার বাবা মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক। মা আলহাজ্ব ফয়জুন্নেছাও তাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতেন। তারা দু'জনেই সাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষকে সাহায্য-সহায়তা করতেন। বাবা-মা'র আদর্শ ও কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আমরা পিতা-মাতা, ৫ বোন ও ২ ভাই অর্থাৎ পরিবারের সদস্যরা মিলে মোহাম্মদ আলী অ্যান্ড ফয়জুন্নেছা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট (MAFTA) প্রতিষ্ঠা করি। সে সময় আমাদের ছোট ভাই ক্যাপ্টেন ডা. রেজাউল করিম ও ভাবীর (তিনিও ডাক্তার) কাছে আমেরিকান ডা. ক্রেক ও ডা. সুজান আসতেন এবং এদেশে চ্যারিটেবল কাজে অংশ নিতেন। যখন এই দম্পতি জানতে পারলেন যে, আমরা দিনাজপুরে MAFTA-র মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্য সেবাসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করছি, তখন তারা আমাদের এসব কাজে সম্পৃক্ত হলেন। এতে আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে যায়। এই দম্পত্তির কাছ থেকে জানতে পারি আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে সুস্বাগতমকে 'আলোহা' বলা হয়। আমরা তাদের সুস্বাগতম বললে তারাও 'আলোহা' বলতেন।

আমরা আমাদের সমাজসেবক পিতা-মাতার সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যেই ১৯৯৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে বাবা ও সকল ভাই বোন

একত্রিত হয়ে 'আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ (এএসএসবি) প্রতিষ্ঠা করি।

প্রত্যয় : আপনারা শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি গৃহহীন মানুষের জন্য 'আপন ঠিকানা' গড়ে তুলে ১২৫ জন গৃহহীন পরিবারকে নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছেন। এ ধরনের একটি উদ্যোগ নেয়ার পেছনে কোন বিষয়টি কাজ করেছে?

মিনারা বেগম : আগেই বলেছি, আমাদের বাবা-মা দু'জনেই দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের সেবা ও তাদের পাশে দাঁড়াতে পছন্দ করতেন। আমরা ভাই বোনরাও তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। একদিন দেখতে পাই কর্তৃপক্ষ রেলওয়ে বস্তি ভেঙে দিলে অসংখ্য মানুষ আকাশের ছাদ নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালো। সে সময় আমার মাথায় কেবলই একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল– এদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। এদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমরা ২০০৯ সালে এ শহরে প্রথম পর্যায়ে ১০৪টি ও ২০১২ সালে আরো ২১টি মোট ১২৫টি গৃহ নির্মাণ করে তা গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করি। এ জন্য আলোহার মাধ্যমে দিনাজপুর শহরের পশ্চিম রামনগরে আমার স্বামীর একটি মূল্যবান জায়গার একটা অংশ স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে নেই। একটি ভালো কাজ করছি বলে তিনি আর না করেননি।

আমরা জার্মান সরকারের আইএলডি জার্মানীর সহায়তায় Shanti Germany'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১২৫টি পরিবারের জন্য পরিকল্পিতভাবে 'আপন ঠিকানা' গড়ে দিয়েছি। আমার খুবই ভালো লাগে শহরে ভাসমান বেশ কিছু ছিন্নমূল মানুষের নিরাপদ আশ্রয় লাভের হাসি মুখ দেখে।

প্রত্যয় : আপনারা কি 'আপন ঠিকানা' কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক?

মিনারা বেগম : আমরা চেষ্টা করছি এ ধরনের একটি ভালো কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার। কিন্তু একসাথে অনেক জায়গা পাওয়া মুশকিল। এ ব্যাপারে সরকারের সহায়তা অর্থাৎ খাস জমি বরাদ্দ পেলে এই কার্যক্রম বিস্তৃত করা সম্ভব।

প্রত্যয় : আপনারা কমনজেন্ডারদের মূল ধারায় নিয়ে আসার অর্থাৎ তাদেরকে প্রকৃত মানুষের মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে কাজ করছেন। এ ক্ষেত্রে আপনারা কতোটা সফল হচ্ছেন বলে মনে করেন?

মিনারা বেগম : যে কোনো কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় এবং তা যদি আন্তরিকতার সাথে করা যায় তবে তার সাফল্য আসবেই। আপনাদের বলবো, কাজটি খুব কঠিন হলেও আমরা সফল হয়েছি। আমরা জেনেছি দিনাজপুরে প্রায় ৩৪০ জনের মতো কমনজেন্ডার রয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা ১২৫ জনকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। এদের মধ্যে এখন প্রায় ২৫/৩০ জন তাদের পরিবারের সঙ্গেই বাস করছেন। অনেকে মানবপল্লীতে থাকছেন পরিবার পরিজন নিয়ে। তারা ভিক্ষা করতেন, এখন তাদের অনেকেই আমাদের ঋণ সহায়তায় গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালনসহ কেউ কেউ দোকানও করছেন। অনেকে পরিবারকে আর্থিকভাবে সাপোর্টও দিচ্ছে। তাদের আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটছে। সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যয় : অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি আপনারা শিক্ষা কার্যক্রমেও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগ নেয়ার পেছনে বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?

মিনারা বেগম : দেখুন, এ দেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠী শিক্ষা বঞ্চিত। এই সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ নারীরই ছোট বেলায় বিয়ে হওয়ায় তারা খুব বেশিদিন পড়াশোনা করার সুযোগ পান না। বিশেষ করে অতীতে আমার মা-খালাদের সময় এটিই ছিল বাস্তবতা। মাত্র ১২ বছর বয়সে মায়ের বিয়ে হয়েছিল বলে তিনি খুব একটা লেখাপড়া করতে পারেননি। মা তার শিক্ষার ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে সকল ছেলে মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। মা চাইতেন সমাজের অসহায় ছেলে মেয়েরাও পড়াশোনার সুযোগ পাক। তার এই ইচ্ছার বাস্তবায়নেই আলোহার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে দিনাজপুর ও নওগাঁয় আমরা দুটো উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি।

প্রত্যয় : আপনি কি মনে করেন দেশের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম এমএফআইদের দ্বারা দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন?

মিনারা বেগম : এটা ঠিক যে, দেশের এমএফআই সমূহই বর্তমানে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। কারণ দেশের ব্যাংকগুলো তাদের সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। আমি মনে করি, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও এমএফআই সদস্যদের অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট রাখা ও তাদের ঋণ প্রদানের সীমা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রত্যয় : দেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে এনজিও খাতের অবদান কতোটা বলে আপনি মনে করেন?

মিনারা বেগম : এটি সত্যিই আনন্দদায়ক যে, আমাদের উন্নয়ন ঘটছে। এখন আর দেশ হিসেবে কেউ আমাদের গরিব বলতে পারবে না এবং আমরা গর্বিত যে, সম্প্রতি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসডিজি অগ্রগতি বিষয়ক সম্মাননা লাভ করেছেন। আমি মনে করি সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি এক্ষেত্রে এনজিও খাতের অবদান অনেকখানি। কারণ এনজিওরা তৃণমূল পর্যায়ে স্থায়ী উন্নয়নের অন্যতম ধারক ও বাহক। তাদের সাফল্যই দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।■

RDRS Bangladesh উত্তরবঙ্গের প্রতিশ্রুতিশীল উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান আরডিআরএস বাংলাদেশ বা রংপুর দিনাজপুর রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিসেস। ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন আমাদের দেশ থেকে যে সব মানুষ শরণার্থী হিসেবে কুচবিহারে আশ্রয় নেয়, তাদের ত্রাণ সাহায্য প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা লুথেরান ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন এগিয়ে আসে। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হলে এই সংস্থা ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মানুষকে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশে আরডিআরএস (রংপুর দিনাজপুর রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিসেস) প্রতিষ্ঠা করেন। বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে আরডিআরএস এর কাজের পরিধি প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালে আরডিআরএস দেশীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে নবযাত্রা শুরু করে।

আরডিআরএস এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে– গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও সমষ্ঠিগতভাবে নিজ প্রচেষ্টায় অর্থবহ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শান্তি, ন্যায়বিচার এবং টেকসই পরিবেশ অর্জন করবে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও সংগঠন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যেমন স্ব-প্রচেষ্টায় তাদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ ও সেবায় নিজেদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

আরডিআরএস এর এই কর্যক্রমগুলোকে চারটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করে আরডিআরএস-বাংলাদেশ কৌশলপত্র বাস্তবায়িত হয়। এগুলো হচ্ছে– ১. সামাজিক ক্ষমতায়ন– সক্রিয় নাগরিক, সুশীল সমাজ ও ন্যায়বিচার, নাগরিকবৃন্দ, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, সুশীল সমাজের সংগঠনের ক্ষমতায়ন, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সুশাসন, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, পারিবারিক সহিংসতা, পাচার/অপহরন এবং অবিচার প্রতিরোধ সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়ন।

তপণ কুমার কর্মকার
নির্বাহী পরিচালক, RDRS

২. মানসম্মত জীবন– জীবাণুঘটিত রোগ ও এইচআইভি/এইডসসহ প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি, পয়ঃব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও পরিবেশ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মানসম্মত শিক্ষা।

৩. খাদ্য, পরিবেশ ও দুর্যোগ মোকাবেলা– জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও মোকাবেলা, দুর্যোগজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বনির্ভরতা, জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, দক্ষতা ও প্রযুক্তিতে প্রবেশ।

৪. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন– আর্থিক সেবা প্রাপ্তি, বাণিজ্যিক উদ্যোগ ও বাজারের সাথে সংযোগ, মৌসুমী বেকারত্ব ও ক্ষুধা দূরীকরণ।

আরডিআরএস বাংলাদেশ এর বর্তমান প্রকল্পসমূহরে মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– Micro Finance, Socio Economic Empowerment with Dignity and Sustainability (SEEDS), Sustainable & Resilient Farming Systems Intensification (SRFSI), Promoting the Rights of Acid Survivors in the District of Dinajpur (PRAS), Improvement of the Real Situation of Overcrowding in Prisons in Bangladesh (IRSOP).

রংপুরে আরডিআরএস এর কার্যালয়ে প্রত্যয় টিমের কথা হয়েছিলো আরডিআরএস এর মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ এর প্রধান রবীন চন্দ্র মন্ডল এর সাথে। তিনি বলেন, আরডিআরএস রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম এর মধ্যে থাকলেও তাদের ত্রাণ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর ১৯৭৬ সালে স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন সেক্টর প্রোগ্রাম ও প্রকল্প শুরু করে। এর মধ্যে এগ্রিকালচার, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, হেলথ এবং অন্যান্য বিদ্যমান সার্ভিস যেগুলো আছে সেগুলোও দেয়া শুরু হয়। রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণের কাজটিও আরডিআরএস এর মাধ্যমে শুরু। এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মূলত, রাস্তার পাশে গাছ লাগানোর ধারণাটি আরডিআরএস থেকেই শুরু হয়। সেচের জন্য যে ট্রেডল পাম্প (পা দিয়ে চালানো পানির পাম্প) সেক্ষেত্রেও আরডিআরএস ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করেছে। আরডিআরএস এর যে সব বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার ছিল তারা এটি আবিষ্কার করেন এবং ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্প চলমান ছিলো। মূলত নিরাপদ পানির জন্যই এটি করা।

রবিন চন্দ্র মন্ডল জানালেন, বাংলাদেশের এই অঞ্চলে স্কুল নির্মাণের কাজ প্রথম আরডিআরএসই শুরু করেছিলো। অর্থাৎ সরকারের বাইরে উন্নয়ন সংস্থাগুলো যে সকল কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেক্ষেত্রে আরডিআরএসই প্রথম। তখন কেয়ার ছাড়া অন্য কোনো এনজিও এখানে ছিল না। সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও আরডিআরএস এর অবদান অনেক। রংপুর থেকে ৩টি রোড আছে– ১. আরকে বা রংপুর টু কুড়িগ্রাম, ২. আরজি বা রংপুর টু গাইবান্ধা এবং ৩. আরসি বা রংপুর টু চিলাহাটি। এই রোডগুলোর জন্য আরডিআরএস নিজের অর্থায়নেই গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করেছিল।

এই রোডগুলোর দুই পাশে বড় বড় গাছ রোপণ করেছে আরডিআরএস। এভাবে ১৯৮০ থেকে ৮৫ সাল পর্যন্ত কাজ করে আরডিআরএস। এরপর আসে কম্প্রিহেনসিভ প্রজেক্ট। এটিও জেনেভা ভিত্তিক দাতা সংস্থা শুরু করে। তখন সিদ্ধান্ত ছিলো, এক সেন্টার থেকে সব সেক্টর অর্থাৎ এডুকেশন, হেলথ, এগ্রিকালচার ও ট্রেনিং পরিচালিত হবে। সেক্টর প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সব সেক্টরই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ইউনিট গঠন করে।

অর্থাৎ রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে যতগুলো নতুন জেলা আছে সেখান থেকেই সব সার্ভিসগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়। এভাবে আরডিআরএস গত ২৫ বছর যাবৎ এ সার্ভিসটা দিতে থাকে।

রবিন চন্দ্র আমাদের আরো জানালেন, এক সময় আরডিআরএস কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জেনেভা চিন্তা করলো যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনেক পরিবর্তন এসেছে। জেলা পর্যায়ে অনেক ডেভেলপমেন্টের কারণে দেশ দাঁড়িয়ে গেছে, তাই চলে যাওয়া যায়। চলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে তারা চিন্তা করল যে, একটা অর্গানাইজেশন তৈরি করে যেতে হবে যার মাধ্যমে তাদের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থাটি পরিচালনা করার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয় এবং ১৯৯৭ সালে আরডিআরএস একটি উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন লাভ করে। একই সাথে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোসহ অন্যান্য সকল লাইসেন্স করে আরডিআরএস সম্পূর্ণভাবে একটি দেশি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে।

রবিন চন্দ্র আরো বলেন, এই পরিপূর্ণতা লাভ করাটা ছিল আরডিআরএস এর জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট। সিদ্ধান্ত হলো, আমরা যদি সাপোর্ট না দেই তাহলে এই অর্গানাইজেশনটা টিকবে না। দাতা সংস্থারাও এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তখন কিভাবে এই অর্গানাইজেশনটাকে সেলফ সাসটেইনেবল করা যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হলো। সংস্থার নিজস্ব আয়ের খাত সৃষ্টির জন্য তখন তিনটি সেক্টর করা হল। একটি মাইক্রোফাইন্যান্স, দ্বিতীয়টি ট্রেনিং সেল এবং তৃতীয়টি গেস্ট হাউস করে থেকে ইনকাম করা।

রবিন চন্দ্র মন্ডল
হেড অব মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ, RDRS

এই উপায়গুলো বের করে সাসটেইন করার কথা চিন্তা করা হলো এবং একই সাথে উন্নয়ন প্রক্রিয়াও ধরে রাখার প্রশ্ন আসলো।

ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে আরডিআরএস বড় একটা জার্মান প্রতিষ্ঠান থেকে প্রজেক্ট লাভ করে। সেটি ছিলো টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে হিউম্যান রিসোর্সকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, তাদেরকে কিভাবে দক্ষ করা যায় সেই কনসেপ্টে প্রায় ১২শ' কোটি টাকার একটা ফান্ড। এই ফান্ড থেকে আমরা সিএইচআরডিগুলো নির্মাণ করি। এগুলোই আরডিআরএসকে শক্ত ভিতের উর দাঁড় করাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি মাইক্রোফাইন্যান্সকেও ডেভেলপ করা হয়। বর্তমানে রংপুরে আরডিআরএস এর সিএইচআরডি দেশি-বিদেশি সবার কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

আরডিআরএস এর সহায়তায় বদলে গেছে রীনা রাণীর জীবন

রংপুরের রীনা রাণী, স্বামী রতন চন্দ্র সরকার, গ্রাম সেনপাড়া, ওয়ার্ড নং-১২, রংপুর সিটি। এক সময় সংসার ছিল দারিদ্র্যের কষাঘাতে জরাজীর্ণ। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা ছিল হতদরিদ্র এ পরিবারের। স্বামী-স্ত্রী, দু'সন্তান ও শ্বাশুড়িসহ ৫ জনের সংসার। ঘর বলতে ছিল খড়ের ছাউনীর একটি ঘর। এখন সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। টিনশেড বিল্ডিং হয়েছে। ঘরে টিভি ফ্রিজ সবই আছে। জানতে চাইলাম এই পরিবর্তনের কথা। রীনা রাণী ও রতনচন্দ্র সরকার প্রত্যয়ের মুখোমুখি হয়ে যা বললেন :

রীনার স্বামী রতনচন্দ্র সরকার এক সময় রংপুর কারুপণ্যে দৈনিক ২৫ টাকা মজুরি ভিত্তিতে কাজ করতেন। খুবই কষ্টকর সংসার। তাদের এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলেটি শারীরিক প্রতিবন্ধী। পাড়ার নারীদের কাছে জানতে পারলেন আরডিআরএস এর কথা। তারা কর্মোদ্যোগী মহিলাদের জামানত ছাড়া ঋণ দেয়। রীনা ভাবলেন, স্বামীর একা আয়ে কি কষ্টই না করতে হচ্ছে– সেও যদি কিছু করতে পারে তাহলে সংসারের এতো কষ্ট থাকবে না। এ ভেবেই তিনি ২০০৫ সালের ৮ মে আরডিআরএস এর রাজেন্দ্র-পুর শাখার সেনপাড়া মহিলা দলের সদস্য হন। প্রথম দফায় ঋণের টাকায় থাকার জন্য টিনের চালা দেন যাতে রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচা যায়। দ্বিতীয় দফায় ৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ১টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন ৩ হাজার ২শ' টাকায় এবং অবশিষ্ট টাকায় মালামাল ক্রয় করেন ব্যাগ, পাপোস ও ভ্যানিটি ব্যাগ তৈরির জন্য। বিক্রি করে ভালো লাভ হয়। উৎসাহ বেড়ে যায় তাদের।

রীনা রাণী বললেন, ২৫ টাকায় মাত্র ২ কেজি চাল হতো– ডিম-দুধ দূরের কথা নুন, মরিচ আর শাক ছাড়া কিছুই জুটতো না। ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় স্বামী কাজ ছেড়ে দিয়ে যোগ দিলেন স্ত্রীর হস্ত শিল্প তৈরির সাথে। আরো একটা মেশিন কিনলেন। তাদের হস্ত শিল্পের নাম দিলেন 'অন্তর হস্ত শিল্প'। অন্তর হস্ত শিল্পের সুনাম বাড়তে থাকে। বিভিন্ন দোকান থেকে অর্ডার পেতে থাকেন।

আরডিআরএস এর সহযোগিতা তাদেরকে সাহস যোগায়। সর্বশেষ ১১ দফায় রীনা রাণী ১৮ ডিসেম্বর '২০ তারিখে আরডিআরএস থেকে ৫৪ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। তারা দুটি সেলাই মেশিন পরিচালনা করছেন। তাদের তৈরি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতোমধ্যে ৬ জন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন। তাদের ঘরে তাদেরই তৈরি করা ১৮ ধরনের পণ্য দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না তাদের দিন বদলের

কথা। এর মধ্যে ৩ লাখ টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন। একদিন তারা নিজেরাই ছিলেন দিনমজুর, এখন তারাই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

রীনা গাভীও পালন করেন। ইতোমধ্যে ৩/৪টা গরু বিক্রিও করেছেন। ৫ লাখ ৩০ হাজার টাকায় ৬ শতক জমি কিনেছেন। জমি কেনার সময় গরু বিক্রির টাকা কাজে লেগেছে। রীনা বললেন, করোনায় আমরা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তবে ভেঙে পড়িনি, সাহস হারাইনি। আরডিআরএস এর ৮ কিস্তি বাদ পড়েছে। কিন্তু তারা চাপ দেয়নি। এখন দিয়ে দেবো। স্বামী রতন চন্দ্র সরকার বললেন, আমরা আমাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করতে চাই। ১ লাখ টাকা ঋণ পেলে শহরে একটা ইলেকট্রিক্যাল শো রুম দেবো। পাশে নিজেদের পণ্য তুলবো। তিনি জানান, ইলেকট্রিক্যাল কাজও তার জানা।

ফেরদৌসি বেগম
নারীর ক্ষমায়নের অনন্য উদাহরণ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন দ্বারা যে দেশের অসংখ্য নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়েছে তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ রংপুর সিটির ১১নং ওয়ার্ডের বখতিয়ারপুর গ্রামের মৃত আনিছুল ইসলামের স্ত্রী ফেরদৌসি বেগম। তিনি ২০০৫ সালে রংপুরের আলোকিত প্রতিষ্ঠান আরডিআরএস এর সদস্য হন এবং কবুতর পালনের জন্য ৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া ফেরদৌসি বেগম ছোটবেলা থেকেই ছিলেন বেশ চটপটে। নেতৃত্বের একটা গুণ তার মধ্যে ছিল। আরডিআরএস এর সদস্য হয়েই তিনি ক্ষুদ্রঋণভুক্ত অন্যান্য দলের সদস্যদের সাথে পরিচিতি লাভ করতে থাকেন। তিনি প্রথমে রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ৩টি ওয়ার্ডে আরডিআরএস এর ৪৩ গ্রুপে ৯শ' জন সদস্য রয়েছে। এ সকল সদস্য গরু পালন, সবজি চাষসহ বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে জড়িত। এখন তারা বেশ সচ্ছল। আরডিআরএস এর সহায়তায় ফেরদৌসি বেগম এখন শুধু সচ্ছলই নন, সামাজিকভাবেও নেতৃস্থানীয় নারী ব্যক্তিত্ব। তার বসত বাড়িসহ পারিবারিক জীবন মানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে।

ফেরদৌসির কষ্ট-জীবন

ফেরদৌসির বাবা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। ১৯৮৯ সালে বিয়ে হয় তার। স্বামী এসএসসি পাস করে কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। শ্বশুর বাড়ির অবস্থাও খুব বেশি ভালো ছিল না। তদুপরি শ্বশুরের ২ স্ত্রীর মধ্যে তিনি ছোট স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হলেন। জায়গা জমি সব তিনি ভাগে নিলেন। ফেরদৌসি বেগম তার স্বামী, দেবর, নিজের শ্বাশুড়ি ও ৩ ছেলে নিয়ে ভীষণ কষ্টে পড়লেন। এ সময় তার স্বামী দিনমজুরিও করেছেন। অনেক দিনই তাদের দুবেলা আহার জুটতো না। এমনই মুহূর্তে ২০০৪ সালে রাজেন্দ্রপুর আরডিআরএস শাখা খুললে তিনি এর সদস্য হন।

প্রথম বাধা : ধর্ম থাকবে না

দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ফেরদৌসি বেগম যখন নিজেদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আরডিআরএস এর সাথে সংযুক্ত হয়ে কাজ শুরু করলেন, তখন সমাজ এমনকি নিজেদের পরিবারের লোকেরাও বাঁধা দিয়ে বলতো– বাড়ির বাইরে গিয়ে মিটিং করে, অফিসে যায়, বেপর্দায় চলাচল করে, সমিতি করে– ওর ধর্ম থাকবে না। কিন্তু ফেরদৌসি বেগম উচ্চকণ্ঠে জবাব দিয়েছেন, আমাদের একবেলা কেউ খাবার দিতে এগিয়ে আসে না। ভালোভাবে খেয়ে পড়ে বাঁচার জন্যই কাজ করছি– সমিতি করছি। তিনি ছিলেন অদম্য। তাকে এমনও প্রশ্ন করা হতো– তুই নাকি খ্রিস্টান হয়ে গেছিস? এখন তার সাফল্যে তারাই তাকে সম্মান করে।

প্রথমে কবুতর এরপর গরু-ছাগল

ঋণ নিয়ে কবুতর পেলে লাভ করতে পারেননি। কারণ, রাতে বাঘডাসা এসে কবুতর খেয়ে ফেলতো। পরে তিনি হাঁস-মুরগী, ছাগল-গরু পালন করে লাভবান হন। ৮ম দফায় তিনি ৯৮ হাজার টাকা ঋণ করেন গাভী পালনের জন্য। তিনি সংস্থা থেকে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান। তিনি মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের কো-প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এক সময় সংস্থার পক্ষ থেকে তিনি ভারত ভ্রমণ ও বিভিন্ন দেশের এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পান। এতে তার মনোবল বৃদ্ধি পায়। দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ তার নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হন এবং তিনি FAO থেকে ৩ দিনের ট্রেনিং লাভ করেন।

ফেডারেশনের কার্যক্রম দেখে তারা ২০১৮ সালে এমএমআই নামক প্রকল্পে ১৫ লাখ ১২ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন। উক্ত টাকা ফেডারেশনের দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে ২০ জনকে গরু পালনের জন্য ৭৫ হাজার ৬শ' টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০২১ সালে অনুদান পেয়েছেন ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এ থেকে দরিদ্র সদস্যদের স্বাবলম্বী করার জন্য ৪০ জনকে ৪২০০০ টাকা করে ঋণ দেয়া হবে। পাশাপাশি ফেরদৌসি বেগমের নেতৃত্বে পরিচালিত ফেডারেশনের হিসাবে বর্তমানে ৬ লাখ টাকার বেশি সঞ্চয় রয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে উদ্যমী নারী ফেরদৌসি বেগম বলেন, ব্র্যাক, আশা, বুরো বাংলাদেশ, আরডিআরএসসহ বিভিন্ন এনজিওদের কার্যক্রমের ফলে দরিদ্র মানুষ আজ সচ্ছলতার মুখ দেখতে সক্ষম হচ্ছে এবং তৃণমূল পর্যায়ের নারীদেরও ক্ষমতায়ন বাড়ছে।■

SSKS ক্লিনিককে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরিণত করতে চাই

রোটারিয়ান বেলাল আহমেদ
জেনারেল সেক্রেটারি অ্যান্ড চিফ এক্সিকিউটিভ
সিলেট সমাজ কল্যাণ সংস্থা (SSKS)

সিলেটের শীর্ষ পর্যায়ের এনজিও সিলেট সমাজ কল্যাণ সংস্থা (SSKS) ১৯৯৮ সাল থেকে স্বাস্থ্য, পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বেশ আলোকিত ও প্রশংসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য খাতে সিলেট বিভাগে SSKS গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৪, ২০০৬ এবং ২০০৮ সালে প্রধানমন্ত্রী পদক লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠানটি সিলেট বিভাগে ২১টি স্থায়ী ক্লিনিক, ১৫৫টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকসহ EOC Clinic, Ultrasonogram, ECG, Ambulance Service, Lab facilities এবং ফার্মেসি সুবিধা চালু করেছে। সিলেট শহরের মির্জা জাঙ্গাল, রামের দীঘির পাড়ে প্রতিষ্ঠিত এসএসকেএস ক্লিনিক– হাসপাতালটিতে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রোগীরা স্বল্প মূল্যে নিরাপদ ডেলিভারির জন্য আসেন। এ ছাড়াও শহরের টিলাগড় ও শেখ ঘাটের কলাপাড়ায় আরো দুটি এসএসকেএস মেটারনিটি ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়গনস্টিক সেন্টার রয়েছে।

এসএসকেএস এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন বর্তমান জেনারেল সেক্রেটারি অ্যান্ড চিফ এক্সিকিউটিভ বেলাল আহমেদ। তার জন্ম সিলেটের দক্ষিণ সুরমার লালাবাজারের ঐতিহ্যবাহী ডাক্তার বাড়িতে। তাঁর পিতা মরহুম ডা. আনোয়ার হোসেন এবং মা জৈবুন্নেছা। সময়ের এই সমাজসেবক ব্যক্তিত্ব লালাবাজার হাইস্কুল থেকে ১৯৭৬ সালে এসএসসি, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে এইচএসসি এবং একই কলেজে ডিগ্রিতে অধ্যয়ন করেন।

ছোট বেলা থেকেই বেলাল আহমেদ সমবয়সীদের নিয়ে ক্লাব সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমাজসেবা কর্মে আত্মনিয়োগ করতেন। কলেজে পড়াকালীন তিনি কনস্ট্রাকশন বিজনেসের সাথে জড়িত হন। আয়ের একটি অংশ তিনি সমাজসেবামূলক কাজসহ থিয়েটার, নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ব্যয় করতেন। এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিলেটের নাট্যায়ন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং কম্পাস থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও জেনারেল সেক্রেটারি।

তিনি 'দেওয়ান হাসন রাজা' ছবিতে অভিনয় করেছেন। জনাব বেলাল এফএনবি সিলেট শাখার সভাপতি। সিলেট জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট জেলা হেলথ রাইটস মুভমেন্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সিলেটের বিশিষ্ট সমাজ উন্নয়ন ও এনজিও ব্যক্তিত্ব রোটারিয়ান বেলাল আহমেদ প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বলেন, তা এখানে উপস্থাপন করা হলো :

প্রত্যয় : জনাব বেলাল আহমেদ, আপনারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে সিলেট সমাজ কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে বলে মনে করেন?

বেলাল আহমেদ : দেখুন, ১৯৮৯ সালে বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী ফখরুল ইসলাম লরেন্স, কামরুল হোসেনসহ আরো কয়েকজন সমমনা বন্ধুরা চিন্তা করলাম সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কিছু করা দরকার। এ জন্যে আমরা সিলেট সমাজ কল্যাণ সংস্থা (SSKS) নামে একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলি এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে এর রেজিস্ট্রেশন নেই। শুরু থেকেই আমরা স্বাস্থ্য সেবা, দুঃস্থ অসহায়দের মাঝে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ, বন্যাক্রান্ত মানুষদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণসহ তাদের মধ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু করি। আমরা পাথ ফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এর টেকনিক্যাল সাপোর্ট USAID, UKAID সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থাসমূহের আর্থিক সাহায্যে প্রতি বছর সিলেট বিভাগের প্রায় ৬ লাখ গ্রাহককে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকি। সরকারের শিশু ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, ব্র্যাক, সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SDF), ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব মাইগ্রেশন (IOM) এবং মেরি স্টেপস বাংলাদেশ (MSB), সিলেট ক্যাডেট কলেজ, নিঃস্ব সহায়ক সংস্থা (NSS)সহ আরো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আমাদের সাথে স্মারক চুক্তি করেছে। এতে করে আমাদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে।

১৯৯৮ সালে আমরা 'হেলদি সিটি' প্রোগ্রাম চালু করি। আমরাই প্রথম UNDP'র সহযোগিতায় সিলেটে ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করি এবং শহরের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের উদ্যোগ নিই। পরবর্তীতে এটি চট্টগ্রাম, কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন শহরে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে চালু হয়েছে। আমি মনে করি SSKS এর এটি একটি বড় সাফল্য।

প্রত্যয় : বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসঘ থেকে এসডিজি অগ্রগতি বিষয়ক

সম্মাননা লাভ করেছেন। এ ব্যাপারে এনজিও সেক্টরের অবদান কতোটা বলে আপনি মনে করেন?

বেলাল আহমেদ : এটা সত্যিই আনন্দের ব্যাপার যে, গত ২১ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওয়ার্ক প্রদত্ত এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার লাভ করেছেন। দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা এবং সবার জন্যে শান্তি-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণের সার্বজনীন আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের সঠিক পথে অগ্রসরের জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ পদক দেয়া হয়। এই যে বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে, দারিদ্র্যের হার ব্যাপকভাবে কমে এসেছে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে, শিক্ষার হার বাড়ছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে ইত্যাদি সাফল্যের পেছনে দেশের এনজিও সেক্টর এবং এমএফআই খাতের ভূমিকা ও অবদান অনেক। আমি মনে করি দেশের এনজিও খাত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। কারণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে সরকারি কর্মকর্তারা কাজ করার খুব একটা সুযোগ পান না, এনজিওরা সেসব জায়গায় কাজ করে সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। আমি মনে করি দেশের এনজিও খাত সরকারের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

প্রত্যয় : আপনি দীর্ঘদিন ধরে এনজিও খাতের সাথে সম্পৃক্ত এবং এফএনবি, সিলেট জেলার সভাপতি। কাজ করতে গিয়ে আপনারা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলবেন কি?

বেলাল আহমেদ : সাম্প্রতিক সময়ে এনজিওদের ট্যাক্স-ভ্যাট ধরা হচ্ছে, ট্রেড লাইসেন্স করতে হচ্ছে– আমি মনে করি এটা ঠিক নয়। আমরা সমাজসেবামূলক কাজ করছি। এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধনই যথেষ্ট। এখন আমাদের ট্রেড লাইসেন্সের পেছনে দৌড়াতে হয়, ভ্যাট-ট্যাক্সের ঝামেলা পোহাতে হয়, আমরাতো ব্যবসা করতে আসিনি। আমরা দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছি। আর যদি এগুলো করতেই হয় তবে সরকারের উচিত আমাদের জন্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা। আমরা বিদেশি ডোনার প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নিকট থেকে সহযোগিতা নিয়ে স্বল্প মূল্যে উন্নততর স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছি। আমাদের যে আয়-ব্যয় তা অডিটেড। এমনকি আমাদের ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে। আমার দাবি, সম্পূর্ণ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট ট্যাক্সের আওতামুক্ত করা উচিত। তাহলে আমরা আরো অধিক মানুষের সেবা দিতে পারব।

প্রত্যয় : আপনারা যখন বিদেশি ডোনারদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন তা বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে পান। কিন্তু দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তা কি এনজিও ব্যুরোর জানার সুযোগ আছে?

বেলাল আহমেদ : অবশ্যই। আমরা যখন কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহায়তা নিই সেটাও আমরা এনজিও ব্যুরোকে অবহিত করি। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছতা রক্ষাই আমাদের বড় পুঁজি। আমরা চাই, যে সব প্রতিষ্ঠানের সিএসআর রয়েছে তারা আরো হৃদয়বান হোন, তারা স্বাস্থ্য সেবা খাতে আমাদের সহায়তা দিন।

প্রত্যয় : আপনি সিলেট জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে দেশে সর্বস্তরে দুর্নীতির ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয়, দুর্নীতি বন্ধে আপনার প্রস্তাবনা কি?

বেলাল আহমেদ : আমি মনে করি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বলতে হবে এরাই এখন এ দেশের চরম শত্রু। তাদের কোনো ক্ষমা নেই। কারণ, দুর্নীতিবাজদের কারণেই আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতিবাজদের দমনের ব্যাপারে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা দিয়েছেন। আমি আশা করছি, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে সাহসী পদক্ষেপ নেবেন।

প্রত্যয় : একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমানে প্রায় প্রতি গ্রামেই সরকারি কম্যুনিটি ক্লিনিকসহ শহর পর্যায়ে সূর্যের হাসি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্লিনিকগুলোতে ডাক্তার কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীরা যান না। ফলে মানুষ স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার প্রস্তাবনা কি?

বেলাল আহমেদ : দেখুন, গ্রাম পর্যায়ে কম্যুনিটি ক্লিনিক ও শহরাঞ্চলে এমনকি উপজেলা পর্যায়েও সূর্যের হাসি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সরকারের একটি ভালো উদ্যোগ। আমরা এক সময় এ নিয়ে আন্দোলনও করেছি সরকারের কাছে। বলতে পারেন এটা আমাদের আন্দোলনেরই ফসল। কিন্তু এটা সত্যিই দুঃখজনক যে, অধিকাংশ স্থানেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য কর্মী নেই।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আমাদের ওয়ার্কিং এরিয়া সিলেট বিভাগের ৪টি জেলাতেই স্থানীয়ভাবে আমরা ২১টি সূর্যের হাসি ক্লিনিক পরিচালনা করছি। সেগুলো 'এসএসকেএস সূর্যের হাসি ক্লিনিক' হিসেবে পরিচিত। আমি মনে করি দেশের অন্যান্য জেলাতেও এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

প্রত্যয় : আপনারা সিলেট সমাজকল্যাণ সংস্থা (এসএসকেএস) এর কর্ম পরিধিকে আরো বিস্তৃত করার চিন্তা ভাবনা করছেন কি?

বেলাল আহমেদ : দেখুন, আপনিও জানেন, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমাদের ইচ্ছে আছে, সিলেট বিভাগের প্রতিটি নাগরিক স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আসুক। আমরা স্বল্প মূল্যে মানুষের দ্বারে দ্বারে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে চাই। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বর্তমানে আমরা ২৫% দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের বিনা অর্থে চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

প্রত্যয় : আপনাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন কি?

বেলাল আহমেদ : আমি বরাবরই এসএসকেএস ক্লিনিককে একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নীত করার স্বপ্ন দেখি। এ জন্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। ডোনারদের কাছেও আমাদের এই আবেদন।■

এনজিওদের কার্যক্রমের ফলে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে

বীর মুক্তিযোদ্ধা মেসাদ্দেক হোসেন বাবলু

সাবেক প্রেসিডেন্ট

রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু। উত্তরবঙ্গের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তিনি রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট। তিনি দুই টার্ম এই চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। এফবিসিসিআই-এরও দুই টার্ম ডিরেক্টর ছিলেন। রংপুরের কৃতি সন্তান মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু '৭১ সালে স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন জীবনের মায়া তুচ্ছ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ভারতে ট্রেনিং মুহূর্তে তাঁকে মুজিব বাহিনীর সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। স্বাধীনতার পর তিনি আবার পড়াশোনায় ফেরেন। পরবর্তীতে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর জন্ম রংপুরে ১৯৫৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলেফ উদ্দিন সরকার ও মা বেগম মজিদা সরকার। তাঁর বড় ভাই মো. মোজাফ্ফর হোসেন চাঁনও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান বাবলু নিজেও একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। রংপুর চেম্বারের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন বিদ্যোৎসাহী এবং উদ্যমী ব্যক্তিত্ব মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু ১৯৯৭ সালে রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (আরসিসিআই) স্কুল নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রংপুর আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় নেতা। একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক হিসেবে তিনি এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণ কাজে ভূমিকা রেখে চলেছেন। প্রত্যয়কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো :

প্রত্যয় : আপনি খুব অল্প বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এত অল্প বয়সে মুক্তিযুদ্ধের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার চিন্তা করলেন?

মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু : আমি তখন জিলা স্কুলের এসএসসি ক্যান্ডিডেট। ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর যখন ১ মার্চ রেডিওতে ঘোষণা দেয়া হল অনির্দিষ্ট কালের জন্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে, তখন বাংলাদেশ আগুনের মতো ফুঁসে উঠলো। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচার হলো– আমরা ঐ দিন ভাষণটি শুনতে পারিনি, তবে পরের দিন শুনেছি। এরপর আমরা স্বেছাসেবক বাহিনী গঠন করলাম। এপ্রিল-মে মাসের দিকে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলাম।

প্রত্যয় : ভারতে যাওয়ার প্রেক্ষাপট মানে রংপুর থেকে কার নেতৃত্বে ভারতে গেলেন এবং সেখানকার কিছু স্মৃতিকথা শুনতে চাই।

মোসাদ্দেক হোসেন : ভারতে প্রথম আমরা কুচবিহার গেলাম। সেখানকার ফ্রন্টব্লক অফিসে বেশ কিছুদিন ছিলাম। আমার আগে আমার বড় ভাই (চাঁন ভাই) গিয়েছিলেন। তার খোঁজ নিয়ে জানতে পারি তিনি তাবুরহাট ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করছেন। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুটমেন্ট করা হয়। চাঁন ভাইয়ের সাথে দেখা করে এলাম। এর বেশ কিছুদিন পর মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হলাম। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো জলপাইগুড়ি জেলার পাঙ্গা। ওখানে মুজিব বাহিনীর ট্রানজিট ক্যাম্প। সেখান থেকে শিলিগুড়ি বাগডোগরা আর্মি এয়ারপোর্টে নিয়ে আসা হলো। সেখান থেকে নেয়া হলো চক্রাতা মিলিটারি একাডেমিতে। যেখানে বৃটিশ সরকারের সময় আইউব খান, ইয়াহিয়া খানরা ট্রেনিং নিতেন। ইন্ডিয়ান জেনারেলরা এসে আমাদের ট্রেনিং দিতেন। আমরা ৪২ দিন ট্রেনিং নিয়েছি। প্রশিক্ষণ শেষে জানতে পারলাম, বঙ্গবন্ধুর ২য় পুত্র শেখ জামাল এখানে প্রশিক্ষণের জন্য এসেছেন। প্রশিক্ষণ শেষে পুনরায় আমাদেরকে পাঙ্গার ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো। এর কিছুদিন পরে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র দিয়ে বর্ডার পার করে দিল এবং আমরা আমাদের আগের টিমের সাথে সংযুক্ত হলাম।

প্রত্যয় : তখন আপনাদের কোম্পানি কমান্ডার কে ছিলেন?

মোসাদ্দেক হোসেন : আমাদের কমান্ডার ছিলেন মকবুল মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রত্যয় : পাকবাহিনীর সাথে আপনাদের প্রথম যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল?

মোসাদ্দেক হোসেন : চাঁপারহাট– চাকলার হাটে আমরা প্রথম যুদ্ধ করি। নভেম্বর মাসে আমরা গেরিলা অপারেশনের জন্য ভিতরে ঢুকলাম পাক আর্মিদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করার জন্য। তাদের ক্যাম্প অ্যাটাক করার জন্য। ঢোকার পর আমরা হারাগাছ অ্যাটাক করলাম ৯ নভেম্বর। শহরের মধ্যে কিছু ছোট খাটো অপারেশন করলাম। এরপর ১৩ নভেম্বর গঙ্গাচরা থানা আক্রমণ করলাম।

প্রত্যয় : আপনাদের জীবন বাজী রেখে যুদ্ধের কারণে আমরা একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ পেলাম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখতেন একটি সোনার

বাংলা প্রতিষ্ঠা করার। এই লক্ষ্য নিয়েই পুরো জাতিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং আমরা সকলে মিলে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম। স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রান্ত হলেও আমরা কি সেই স্বাধীন-সার্বভৌম সোনার বাংলা লাভ করতে পেরেছি? আপনি কি মনে করেন?

মোসাদ্দেক হোসেন : বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে একটি বিধ্বস্ত দেশ পেলেন। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ মুহূর্তে বাংলাদেশের যে এলাকাটা দখল করেছি আমাদের আয়ত্বে নিয়ে এসেছি, তখন সেখানকার ব্রিজ, কালভার্ট, রেল লাইন সব ধ্বংস করে দিয়েছি যাতে পাক বাহিনী আমাদের আক্রমণ করতে না পারে। মিত্রবাহিনীর সহযোগিতার কারণে ৩ ডিসেম্বর সারা দেশে যুদ্ধ শুরু হলো। তখন পাকিস্তানিরাও আবার ব্রিজ, কালভার্ট, রেল লাইন ধ্বংস করতে লাগলো যাতে আমরা ওদের ধরতে না পারি। ফলে এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, যারা ভারত গিয়েছিল সেই প্রায় ১ কোটি লোক দেশে ফিরলে তাদের পুনর্বাসন করা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিদেশ থেকে ডাক্তার এনে তাদের চিকিৎসা করা, বীরঙ্গনাদের পুনর্বাসন করা, অগ্নিসংযোগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িঘর স্থাপনা নির্মাণে টাকার ব্যবস্থা করা, বুদ্ধিজীবী হত্যা– এমন একটা বিভীষিকাময় অবস্থা থেকে দেশকে ঘুরে দাঁড়াতে বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছরে অনেক কাজ করেছেন। দেশটাকে যখন সামনে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলেন তখনই পাকিস্তানের দোসর এ দেশের খুনিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। এরপর ক্ষমতার পালাবদল হলো। জিয়াউর রহমান এলেন, এরশাদ এলেন– প্রায় ২১ বছর তো একটানা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি ক্ষমতায় ছিল। এরপর ৯৬-তে ক্ষমতায় এল আওয়ামী লীগ, ২০০১ সালে জোট সরকার আবার ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচনে পুনরায় আওয়ামী লীগ জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছে এবং এখনো কন্টিনিউ করছে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজগুলো বর্তমানে তার কন্যা শেখ হাসিনা সমাপ্ত করার চেষ্টা করছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিতে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা। আমি বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা লাভ করতে সক্ষম হবো।

প্রত্যয় : যুদ্ধের সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অনেক ব্রিজ, কালভার্ট, রেললাইন ধ্বংস করেছিল এবং একই সাথে পাকিস্তানিরাও তা করেছিল। তখন আমাদের জনগণের যে দুর্ভোগ হয়েছিল তা কিভাবে সামাল দিয়েছিল?

মোসাদ্দেক হোসেন : আমাদের প্রতি জনগণের অবাধ সমর্থন ছিল। বরং তারা এসব ভাঙ্গার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করতো। কারণ, পাকিস্তানিরা এসে যাতে আমাদের মেয়ে ছেলেদের অত্যাচার, ধন-সম্পদ লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করতে না পারে।

প্রত্যয় : আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের দেশে দেখা যায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকদের মধ্যে কিছু কিছু লোক দুর্নীতির সাথে যুক্ত। এর ফলে সার্বিকভাবে দলের কিংবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দুর্নাম হয়। এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

মোসাদ্দেক হোসেন : বর্তমান সরকার সরকারি কর্মচারীদের বেতন কয়েক গুণ বাড়িয়েছে। তারপরও কিন্তু তারা দুর্নীতি করেই যাচ্ছে। তাই যারা দুর্নীতি করার তারা তা করবেই। আবার

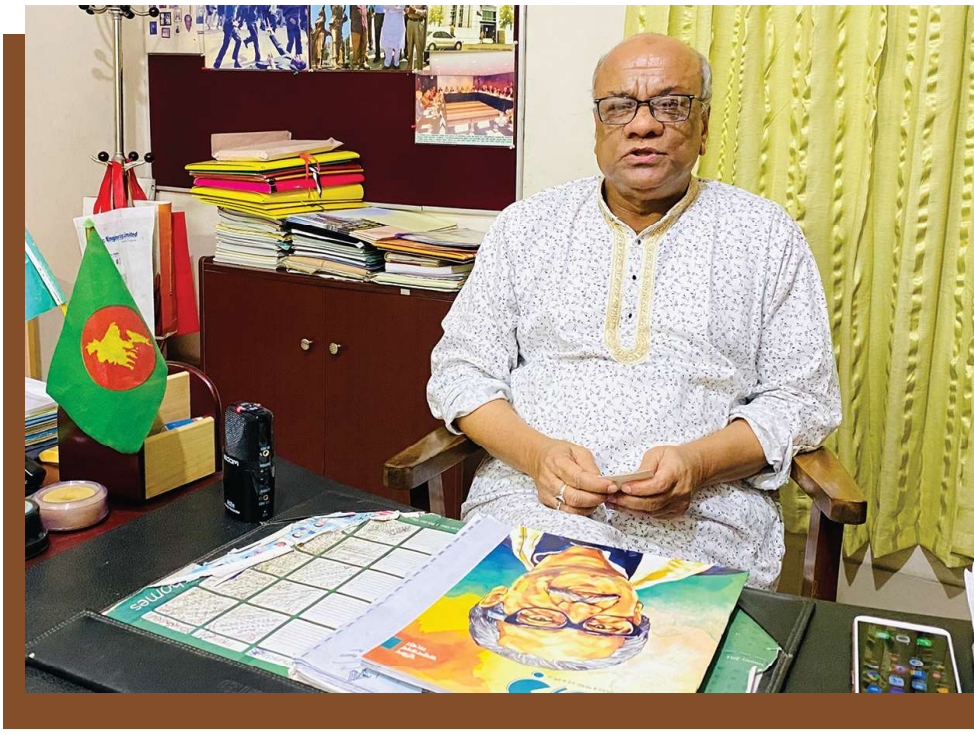

যারা সৎভাবে বাঁচার চেষ্টা করেন এই বেতন বৃদ্ধি তাদের জন্য উপকার হয়েছে। এছাড়া কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষ আছে যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তখন সে দলে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতি বিষয়ে 'নো টলারেন্স' ঘোষণা দিয়েছেন। আমি মনে করি এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

প্রত্যয় : বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আশা করছি ভবিষ্যতে মধ্যম এবং উন্নত দেশে পরিণত হবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ থেকে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) পদক পেয়েছেন। সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো যারা দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়নে ব্যাপক কাজ করছে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। আপনি কি মনে করেন দেশের উন্নয়নে ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা ভালো অবদান আছে?

মোসাদ্দেক হোসেন : অবশ্যই। কিছু মানুষ আছে যারা ব্যক্তিগতভাবে চড়া সুদ নেয়, যেটাকে দাদন বলা হয়। তাদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য এনজিওদের এই পদক্ষেপ খুবই ভালো। দাদনের সুদ তো অনেক বেশি, অমানবিক। এনজিওরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করছে। তাদের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে।

প্রত্যয় : দেখা যায়, যারা ১০ বছর আগে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে তারা এখন ৫/১০ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে বড় খামার করছে। যে অন্যের বাড়িতে কাজ করতো সে এখন উদ্যোক্তা হয়ে অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। এনজিওদের এই অবদান সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু : ২/৪ বছর আগেও আমরা দেখতাম যে ঈদুল আজহার সময় ভারত থেকে গরু না এলে আমাদের কোরবানীর গরু পাওয়া কঠিন হতো। কিন্তু গত দুই বছর থেকে দেখছি গবাদি পশু পালনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর এটা তো আপনাদের মতো এনজিওদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। সরকারের কিছু নীতি নির্ধারণের কারণে ব্যাংক লোন দিচ্ছে, আবার আপনারাও বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষদের এসব

কাজে ঋণ দিচ্ছেন। সে কারণেই তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের জীবনমানে পরিবর্তন এসেছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যয় : আপনি মহান মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেক রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তারপরও আপনি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের আদর্শ ধারণ করে রাজনীতি করছেন। এ বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।

মোসাদ্দেক হোসেন : আমি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। '৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ড সংঘটিত হবার পর ক্ষমতা বদল হলে বিভিন্ন সময়ে নানারকম রাজনৈতিক নির্যাতন সহ্য করেছি। কিন্তু কখনো আপোষ করিনি। কোনোদিন দল পরিবর্তন করিনি। পারিবারিকভাবে আমরা ব্যবসায়ী। আমার

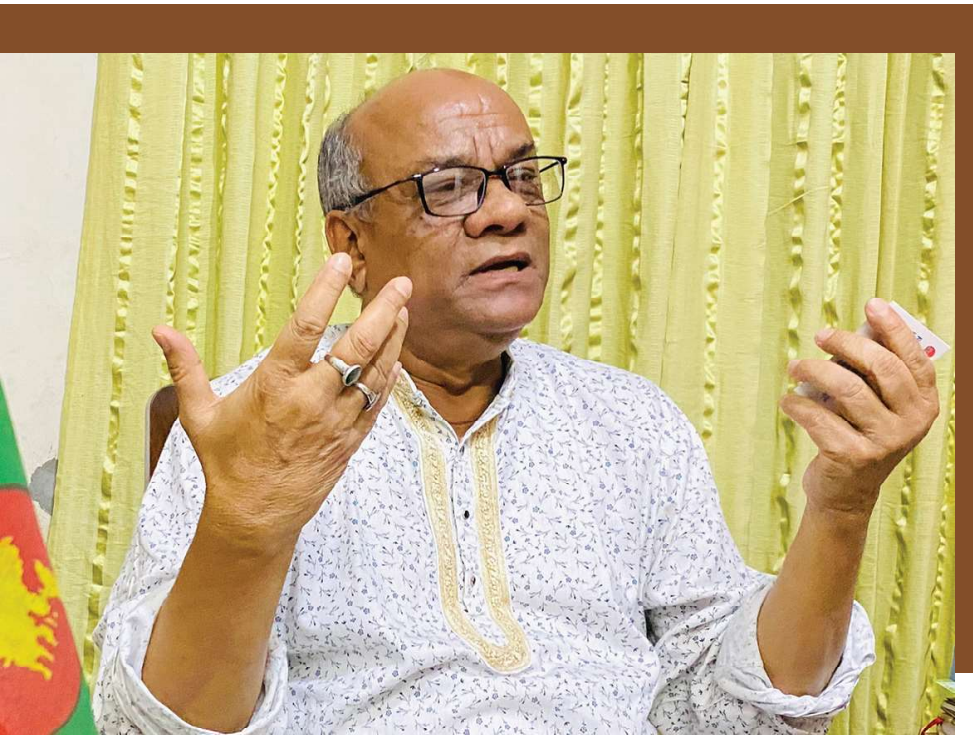

দাদা-বাবা ব্যবসা করেছেন, আমি ব্যবসা করছি। আমাদের ভাই-বোন ব্যবসায়ী কিন্তু আমরা রাজনীতি সচেতন। আমি রংপুর চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। ১৯৯৭ সালে আমি রংপুর চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (আরসিসিআই) স্কুল প্রতিষ্ঠা করি। আমি দুই টার্ম এফবিসিসিআই এর ডিরেক্টর ছিলাম।

প্রত্যয় : আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি?

মোসাদ্দেক হোসেন : আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি এবং তাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছি সবাই এখন সত্তরোর্ধ্ব। আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহ যদি আর কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে পদ্মা ব্রিজ, মেট্রো রেলসহ সরকারের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন মেগা প্রকল্প দেখে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমার পরিকল্পনা একটাই– মানুষের জন্য সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে যাবো।

প্রত্যয় : আপনাদের সাথে অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন যারা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেক পিছিয়ে আছেন, স্বচ্ছলতা পাননি, অনেকে আবার ঠিকমতো ভাতাও পান না। আপনি কি একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে এ ব্যাপারে কোনো খোঁজ-খবর নিয়েছেন?

মোসাদ্দেক হোসেন : রংপুরে যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা, তারা ভাতা পায়নি কিংবা তালিকাভুক্ত হয়নি এরকম আমার জানা নেই।

প্রত্যয় : আপনার কি মনে হয় রংপুরেও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা আছে এবং তাদের সম্পর্কে কি সংশ্লিষ্ট মহলে জানিয়েছেন?

মোসাদ্দেক হোসেন : হ্যাঁ, এমন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রংপুরে আছে। তাদের সম্পর্কে জানিয়েছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। সব জায়গাতেই কিছু লোকজন আছে যারা অনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত।

প্রত্যয় : মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের দল ক্ষমতায়। তাদের একটা দায়িত্ব আছে যে এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া। কিন্তু বলার পরও কোনো কাজ হচ্ছে না। এখানে কি পরিকল্পনায় কোনো ঘাটতি আছে?

মোসাদ্দেক হোসেন : এসব নিয়ে আমরা শোরগোল করি না, গণমাধ্যমে জানাই না। কারণ এতে আমাদের দুর্নামটা আরো বাড়ে। ঘরোয়া মিটিংয়ে আমরা অনেক কথাই বলি কিন্তু খুব একটা কাজ হয় না। তবে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই কিন্তু ঘৃণার চোখে দেখে।

প্রত্যয় : আপনি একজন ব্যবসায়ী। বাংলাদেশে ব্যবসায়ের প্রকৃতি কি ধরনের বলে মনে করছেন। বর্তমান সরকার কি ব্যবসাবান্ধব–আপনার কি অভিমত?

মোসাদ্দেক হোসেন : কোভিডকালীন বর্তমান পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সামাল দিয়েছেন তাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খুব একটা খারাপ না। অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক ভালো। আমি মনে করি বর্তমান সরকার অবশ্যই ব্যবসাবান্ধব।

প্রত্যয় : এক সময় রংপুর ছিল ঢাকা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটি শহর। পরবর্তী সময় বঙ্গবন্ধু সেতু হওয়ার পর যোগাযোগ সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে। এখন এটি বিভাগীয় শহর। সে হিসেবে কি এখানে আশানুরূপ শিল্প-কল-কারখানা গড়ে উঠেছে? কিংবা আর্থিক প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে?

মোসাদ্দেক হোসেন : শিল্প-কল-কারখানার দিক দিয়ে রংপুর এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। তবে সরকার এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছে। কোভিডকালীন পরিস্থিতির কারণে কাজ এগুচ্ছে না এবং এ মুহূর্তে আমরাও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে বিব্রত করতে চাই না।

প্রত্যয় : আপনি শুধু মুক্তিযোদ্ধাই নন, একজন ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক ব্যক্তিত্ব। এই যে আপনি মানুষের সেবা করেন, সমাজের উন্নয়নে কাজ করেন এর পেছনে কোন বিষয়টি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে?

মোসাদ্দেক হোসেন : দেখুন, সব ধর্মেই বলা আছে 'মানুষ মানুষের জন্যে'। বিশেষ করে আমাদের ইসলাম ধর্মে মানুষের সেবা করাকে ইবাদত হিসেবে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে আহার গ্রহণের আগে প্রতিবেশিরা অভুক্ত কিনা তার খোঁজ-খবর নেয়ার। আমি মনে করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে সামর্থ্য দিয়েছেন তার উচিত অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করা। এ দেশের সামর্থ্যবান মানুষগুলো যদি দুঃস্থ অসহায় ও গরিবদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাহলেও অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রত্যয় : আপনি কি আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন?

মোসাদ্দেক হোসেন : নির্বাচন করার চিন্তা-ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের এখানে সমস্যা হলো জাতীয় পার্টির সাথে কোয়ালিশন। বর্তমানে জাতীয় পার্টির সমর্থন কমে যাওয়ার পরও যেটুকু আছে তা রংপুরেই কিছু আছে। সুতরাং এ নিয়ে আপাতত ভাবছি না।■

ছাত্র জীবনেই বর্তমান প্রজন্ম লোভী হয়ে উঠছে

অধ্যাপক মনোতোষ দে

শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ঠাকুরগাঁও

অধ্যাপক মনোতোষ কুমার দে। ঠাকুরগাঁওয়ের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। জন্ম ১৯৪৩ সালের ৩১ অক্টোবর ঠাকুরগাঁও শহরের ঘোষপাড়ায়। পরে স্থায়ী হয়েছেন শহরের আশ্রমপাড়ায়। পিতা সন্তোষ কুমার দে, মাতা উষা রাণী দে।

তিনি ঠাকুরগাঁও হাই স্কুল থেকে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ৩৩ বছর বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতা করে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজ থেকে। স্ত্রী অরুণা দে এবং একমাত্র কন্যা নির্মলাকে নিয়েই তার সংসার।

অধ্যাপক মনোতোষ কুমার দে'র লেখালেখির শুরু কৈশোরেই। ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকের সাময়িকীসহ নাট্য ত্রৈমাসিক 'থিয়েটারে' তার প্রবন্ধ-নিবন্ধ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। তার প্রথম বই 'জীবনানন্দ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে 'তুমি ফের ঘুরে ঘুরে ডাকো সুসময়' এবং 'ধামের গান' বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। তিনি সমাজ, লোকশিল্প ও ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা কর্মও সম্পাদনা করেছেন। ২০১৪ সালে লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ঠাকুরগাঁও থেকে সম্মাননা লাভ করেছেন। তিনি ঠাকুরগাঁও জেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেন :

প্রত্যয় : আপনি লোক-সংস্কৃতি নিয়ে কি ধরনের কাজ করেছেন?

অধ্যাপক মনোতোষ কুমার দে : সব জেলাতেই লোক-সংস্কৃতির আলাদা একটি ধারা আছে এবং সেটিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জনপদের মানুষ আনন্দ-বিনোদনের মধ্যে বেঁচে থাকে। শুধু বিনোদন না তার মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য সেটিকে তারা ধারণ করার চেষ্টা করে। এই অঞ্চলেও একটি লোক-নাট্য ফর্ম আছে, সেটিকে বলা হয় ধামের গান। যদিও এটিকে বলা হচ্ছে ধামের গান কিন্তু এটা গান নয়, এটা হলো একটা নাট্য আঙ্গিক। এই নাট্যটি কখনো গীত আকারে পরিবেশন করা হয় আবার কখনো কখনো গদ্য আকারে পরিবেশিত হয়। কিন্তু এটির কোনো স্ক্রিপ্ট নেই। তাৎক্ষণিকভাবে মঞ্চে পরিবেশন হয়ে থাকে। সকল ধরনের মানুষই এর সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাধারণত গ্রামীণ হিন্দুদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আছে, তারা লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে এই পারফরম্যান্সটি নিয়ে আসে। এখন অবশ্য হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই এটি ছড়িয়ে গেছে।

প্রত্যয় : ধামের গানের মূল থিম কি?

মনোতোষ দে : একটি অঞ্চলের সামাজিক সমস্যা, সংকট, অন্যায়ের প্রতিবাদ এসব চিন্তাই ধামের গানের থিম হিসেবে থাকে এবং এটি খুবই পপুলার। দেখা যায় যারা শ্রোতা-দর্শক তারা টিভির অনুষ্ঠান কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যায় ধামের গান শুনতে। আরেকটি বিষয়, তারা আঞ্চলিক ভাষাটাকে ব্যবহার করে।

প্রত্যয় : আপনি একজন প্রাজ্ঞ শিক্ষক, জ্ঞানী বুদ্ধিজীবী। শিক্ষা-দীক্ষায় আমাদের দেশ এগুচ্ছে। এক সময় দেশে শিক্ষার হার ছিল ২০%, এখন সেটা প্রায় ৭০%। কিন্তু শিক্ষার উন্নয়ন ঘটার পরও মানুষের যে অবক্ষয় তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবক্ষয়ের পেছনে কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

মনোতোষ দে : শিক্ষার উন্নয়ন কথাটা আমরা বলি। বিদ্যা এবং শিক্ষা দুটো শব্দ আছে বাংলায়। এ শব্দ দুটোকে আমরা সমার্থক শব্দ বলে মনে করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ শব্দ দুটোর আলাদা অর্থ আছে। এ সম্বন্ধে আমি জানলাম রবীন্দ্রনাথ পড়তে গিয়ে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'বিদ্যা আহরণে, শিক্ষা আচরণে'। আমরা আহরণ করছি কিন্তু আহরিত বিষয়টা আচরণে যুক্ত করছি না। যার ফলে মূল্যবোধের অবক্ষয়টা থেকে যাচ্ছে। ওয়ান ইলেভেনের সময় আমরা দেখলাম তথাকথিত শিক্ষিত লোকজনদের দুর্নীতির দায়ে জেলে ঢোকানো হচ্ছে। এরা আসলে শিক্ষিত নন, এরা বিদ্যান। আমরা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে পারিনি, যে মানুষটির মধ্যে আদর্শ থাকবে, দেশ প্রেম থাকবে, নৈতিকতা থাকবে। কিন্তু সেই জিনিসটি আমাদের শিক্ষায়তনের মাধ্যমে করতে পারছি না। ফলে এই ঘাটতিটা থেকে যাচ্ছে। উপরন্তু

এটা আরো তীব্র হচ্ছে। যে যেখানেই লেখাপড়া শিখতে যাচ্ছে, তার মধ্যে একটা লোভ ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই লোভটা দিনে দিনে বাড়ছে। এখন একটা ছেলে লেখাপড়া করছে ইউনিভার্সিটিতে বা যেখানেই করুক তার কিন্তু একটা টার্গেট থাকে, সে কেমন করে অনেক বেশি উপার্জন করবে। আমার মনে হয় সে কারণেই এই অবক্ষয়গুলো আমাদের মধ্যে প্রবল হচ্ছে। ভোগবাদিতা আমাদের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে। যারা এই পর্যায়ে লেখাপড়া করছে তারা কেউ আর আমার মত টিনের ঘরে থাকতে চাইবে না। তারা চায় আলীশান বাড়ি-গাড়ি, একটা বিলাসবহুল জীবন যাপন।

প্রত্যয় : বিদ্যা এলো কিন্তু শিক্ষাটা এলো না– এর সাথে কি সংস্কৃতি চর্চাহীনতাও আছে?

মনোতোষ দে : অবশ্যই। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, 'আমাদের শিক্ষা থেকে একটা জিনিস খসে পড়ে গেছে। সেটা হচ্ছে সংস্কৃতি। তিনি ভাষাটা এভাবে বলেছেন, 'আমাদের শিক্ষা থেকে সংস্কৃতিটা স্খলিত হয়ে গেছে।' যার ফলে প্রকৃত শিক্ষাটা পাচ্ছি না। আমরা ইনফরমেশন সংগ্রহ করছি কিন্তু এই ইনফরমেশনটাই নলেজ না। আবার নলেজের পরে আরেকটা ধাপ আছে সেটা হচ্ছে উইজডম। যেটা আপনি বললেন, প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাটা হচ্ছে চরম উৎকর্ষের দিক। কিছু জানলেই প্রজ্ঞাটা নিজের মধ্যে আসবে না। যখন কোনো কল্যাণমূলক চিন্তা আপনাকে আচ্ছন্ন করবে তখন প্রজ্ঞালোক উদ্ভাসিত হবে।

প্রত্যয় : সন্তানদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষকদের। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখন যারা শিক্ষক, তাদের শিক্ষা দানের ব্যর্থতা কি এর পেছনে কাজ করছে বলে মনে করেন?

মনোতোষ দে : অবশ্যই। তবে এই ব্যর্থতা শুধু তাদেরই নয়, আমরাও ব্যর্থ হয়েছি। তা না হলে আমরা এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করতাম না। যারা আজ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত তারাতো আমাদেরই ছাত্র। তারাই তো বিভিন্ন দুর্নীতি, অনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে তা আমাদের কারণেই হয়েছে, আমরা পারিনি তাদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে।

প্রত্যয় : এই ব্যর্থতার দায় কি শুধু শিক্ষকদের দেব নাকি আমাদের সমাজ যারা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের? কারণ তাদের ঘাটতিই তো শিক্ষকদের উপর বর্তায়।

মনোতোষ দে : ঠিক। সমাজে সবার ব্যর্থতাই এখানে প্রকটভাবে আছে।

প্রত্যয় : আপনি দুর্নীতিবিরোধী কমিটির সভাপতি। কমিটি মনে করেছে এ ব্যাপারে আপনি সোচ্চার, সত্য কথা বলেন, লোভের দিকে কখনো ধাবিত হননি। এসব চিন্তা-ভাবনা করেই একজন মানুষকে সমাজে মূল্যায়ন করা হয়। এখন যে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এটিকে কিভাবে কার্যকর করা যায়?

মনোতোষ দে : আমরা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর সহযোগী হিসেবে কাজ করছি। কিন্তু সরাসরি দুর্নীতিবিরোধী যে কাজ সে কাজগুলো আমরা করি না। আমরা সচেতনতা তৈরি করি।

প্রত্যয় : দুর্নীতিকে দিবস কিংবা সেমিনারের মধ্যে না রেখে বরং যে সকল জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছে তার রিপোর্ট বিভিন্ন গণমাধ্যমে কিংবা দুদকের কাছে উপস্থাপন করার কোনো চিন্তা-ভাবনা কি আপনাদের আছে?

মনোতোষ দে : দুর্নীতিবিরোধী অভিযোগগুলো ওদের কাছে অনেক আছে। আমার একজন ছাত্র ছিল দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিটির পরিচালক। সে বলল, স্যার, আমাদের কাছে সব আছে কিন্তু সবগুলোকে আমরা এখন ধরব না। আমরা এখন বড়গুলোকেই ধরব যারা ফসকাতে পারবে না। আমরা নিশ্চিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেব। এ কাজটি আমরা দেখে শুনে আস্তে আস্তে করছি। কারণ এর সাথে বিশাল নেটওয়ার্ক, বড় বড় লোকজন জড়িত আছে। একসাথে ধরলে সিস্টেমটা ভেঙে পড়বে। আমি বুঝতে পেরেছি, তার কথায় কিছুটা সত্যতা আছে।

প্রত্যয় : একজন শিক্ষার্থীর ছোট বেলা থেকেই একটা স্বপ্ন থাকে; আগে পড়ানো হতো 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চরে সে'। সেই নৈতিক শিক্ষা কি আবার স্কুলে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা দরকার?

মনোতোষ দে : হ্যাঁ। এগুলোতো চিরন্তন ব্যাপার, এগুলোকে সামনে আনতেই হবে। কিন্তু এগুলোকে বর্জন করে একটু ভিন্ন ধারায় আমাদের এই জাতিটাকে শিক্ষার সাথে যুক্ত করতে চাচ্ছি। এটিই হয়ে গেছে অসুবিধা। আমাদের শিক্ষার সাথে যুক্ত কর্মকর্তা যারা আছেন, যারা মন্ত্রণালয়ে যুক্ত আছেন তারা দেশের বাইরে গিয়ে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে এসে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করছেন। এটা তো কখনো হতে পারে না। আমাদের দেশের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এখানকার শিক্ষা উন্নত করতে হবে।

প্রত্যয় : সম্প্রতি সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এইচএসসি'র আগে সায়েন্স, আর্টস, কমার্স বলে কোনো বিভাগ থাকবে না। এটিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

মনোতোষ দে : এটি একটি ভালো উদ্যোগ। আমরা যখন কাউকে কিছু চাপিয়ে দেই তখন সেটা ধারণ করার মতো মানসিক শক্তি থাকে না। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যারা নিচের লেভেলে ভালো রেজাল্ট করেছে, ইউনিভার্সিটিতে তারা খারাপ করেছে। আবার ইউনিভার্সিটিতে তাদেরকেই ভালো করতে দেখি যারা আগে ভালো করেনি। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রত্যয় : অনেক অভিভাবকই চান তার সন্তান জিপিএ-৫ পাক, তারা শিক্ষা চাচ্ছেন না, চাচ্ছেন সন্তানের সার্টিফিকেট। এই জায়গা থেকে তাদেরকে ফেরানো যায় কি না?

মনোতোষ দে : অভিভাবকদের মধ্যে একটা লোভ তৈরি হয়ে গেছে। সন্তান তাদের কাছে একটা ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে। খুবই স্বার্থপর আমরা, সন্তানদের যে ভালোবাসি এ জায়গাটায় আমার সন্দেহ আছে, প্রশ্ন আছে। আমি সন্তানকে ভালোবাসি এই কারণেই যে, ভবিষ্যতে সে আমার দেখভাল করবে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসার জায়গাতে একটা অবক্ষয় এসে গেছে। দেখা যায়, পরিবারে যে ছেলেটি বেশি আয় করে বাবা-মা তার দিকে চলে যায়। স্নেহের এই জায়গাটি এখন বস্তুবাদী চিন্তাধারায় রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রত্যয় : আপনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় আপনার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিষ্ঠিত। এখন আপনার চিন্তা কি নিয়ে? লেখালেখিতে কি নিজেকে আরো সম্পৃক্ত করার আগ্রহ আছে?

মনোতোষ দে : লেখালেখির বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছিলাম। আমি তো লেখক নই, পাঠক। আমি যে একজন পাঠক সেটাকে তুলে ধরার জন্য আমার এই লেখালেখি। লেখকরা যে অর্থে লেখক আমি তেমন লেখক নই। তবে আমি কিছু কিছু লেখালেখি করেছি। প্রিন্টিং ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখন অনেকেই লেখেন। অনেকেই বই উপহার দেন।

প্রত্যয় : ৬৪টি জেলার মধ্যে একটি হচ্ছে ঠাকুরগাঁও, যেখানে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন। কি কি কারণে আপনি ঠাকুরগাঁওকে অন্যান্য জেলা থেকে আলাদা মনে করছেন?

মনোতোষ দে : এ সম্পর্কে আমার একটা লেখা আছে। ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন থেকে ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা নামে একটি প্রকাশনা বের হয়েছে সেখানে আমি এই জেলার স্বাতন্ত্র সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরেছি। আমি বলেছি যে, পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই জেলার মানুষের মধ্যে একটা উদারতা আছে। এখানকার মানুষরা সবাইকে আহ্বান জানায়, বাইরে থেকে মানুষজন এ জেলায় এসে আস্তে আস্তে বসতি গড়ে তুলেছে। এই অঞ্চলের বিশেষ কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নেই কিন্তু একটা সাধারণ সৌন্দর্য আছে। এই জেলার মানুষ শান্তিপ্রিয়, তবে আন্দোলন-সংগ্রামেও তাদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। এখানকার লোকজন ছিল খুব সহজ সরল কিন্তু বাইরের লোকজন আসার পর তাদের মধ্যে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা বেড়ে গেছে ■

জলবায়ুর পরিবর্তন ও আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা

এ বি এম তাজুল ইসলাম

জলবায়ু হচ্ছে কোনো এলাকা বা ভৌগোলিক অঞ্চলের ৩০-৩৫ বছরের গড় আবহাওয়া। জলবায়ুর পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু বৈশ্বিক জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় হুমকি। প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কিছু কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশেসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যা হিমালয় ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থান, মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতার কারণে বাংলাদেশ অনেক বেশি বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে।

জলবায়ুর এই পরিবর্তন আমাদের কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। যেমন; বর্তমান চাষ এলাকায় মাটির উর্বরতা কমে গিয়ে সামগ্রিক উৎপাদন হ্রাস পাবে। শস্যের গুণাগুণ ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আসবে। উপকূলীয় এলাকায় লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাবে ও পানির স্বল্পতার কারণে খরাপ্রবণ এলাকার বিস্তার ঘটবে। নতুন নতুন বালাই দেখা দিতে পারে ফলে কৃষিতে কীটনাশক ও সারের প্রয়োগ বাড়াতে হবে এবং অতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলবে। এছাড়া মৎস্য বৈচিত্র্য কমে যাওয়াসহ প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেবে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২১০০ সন নাগাদ সাগর পৃষ্ঠ সর্বোচ্চ ১ মিটার উঁচু হতে পারে, যার ফলে বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৮.৩ শতাংশ এলাকা নিমজ্জিত হতে পারে। এ পূর্বাভাস সত্যে পরিণত হলে বাংলাদেশকে উক্ত এলাকার কৃষি জমিসহ সব কিছুই হারাতে হবে।

কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

তাপমাত্রাজনিত প্রভাব:

তাপমাত্রার বৃদ্ধি জলবায়ু ও আবহাওয়ার স্বাভাবিক অবস্থাকে অস্বাভাবিক ও অস্থিতিশীল করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনে কৃষিখাতই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ খাত, কারণ এর উৎপাদনশীলতা পুরোপুরি তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, আলোর তীব্রতা, বিকিরণ এবং দিবস দৈর্ঘ্য বা রৌদ্রের সময়কাল ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। শস্য উৎপাদনে তাপমাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। প্রতিটি ফসলের অঙ্গজ বৃদ্ধি ও প্রজনন কার্যক্রমের জন্য তাপমাত্রার একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা থাকে। যখন তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে যায় বা নির্দিষ্ট সীমার ওপরের সীমাটি অতিক্রম করে তখন ফসলের উৎপাদন নানা প্রকার সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়। যেমন, ধানের ফুল আসা পর্যায়ে (Flowering stage) তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করলে বা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর নীচে নেমে গেলে শীষে ধানের সংখ্যা কমে যায় এবং ধানে চিটার পরিমাণ বেড়ে যায়। তেমনি সবজী ফসলের ক্ষেত্রে উপরোক্ত মাত্রায় তাপমাত্রা বিরাজ করলে ফুলের পরাগরেণু শুকিয়ে গিয়ে পরাগায়ন বিঘ্নিত হয় এবং নিম্ন তাপমাত্রায় গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি স্তিমিত হয়ে যায় যা ফসলের উৎপাদনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। একইভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় গমের ফলন হয় না এবং তাপমাত্রা বর্তমানের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে আমাদের দেশে গম চাষ সম্ভব হবে না।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে দানা শস্যসহ বিভিন্ন সবজী ও ফল ফসলে নতুন নতুন বিভিন্ন রোগ-পোকামাকড় এবং জীবাণুর আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতিরিক্ত তাপ এবং আর্দ্রতা গাছের ছত্রাকজনিত রোগ বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং

একইভাবে পোকামাকড় ও বিভিন্ন রোগের বাহক পোকার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়।

শুধু ফসলের ক্ষেত্রেই নয় উচ্চ তাপমাত্রায় বদ্ধ জলাশয়ে মাছের কৃত্রিম প্রজনন সমস্যা হতে পারে ফলে সময়মতো পুকুরে ছাড়ার জন্য পোনা মাছ পাওয়া যাবে না। তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে হলে চিংড়ি পোনার মৃত্যু হার বেড়ে যায়। একই কারণে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রজননে ব্যাঘাত ঘটতে পারে এবং মাছের ডিম শরীরে শোষিত হয়ে গিয়ে ডিম ছাড়ার পরিমাণ কমে যায় ফলে সার্বিকভাবে মৎস উৎপাদন কমে যেতে পারে।

নিম্ন তাপমাত্রা ও শৈত্যপ্রবাহ জনিত প্রভাব:

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে শীতকালের ব্যাপ্তি ও শীতের তীব্রতা দুই-ই কমে আসছে কিন্তু শৈত্যপ্রবাহের মাত্রা বেড়েছে। ফলাফলসরূপ বেশির ভাগ রবি ফসলেরই স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে ফলনের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। তীব্র শৈত্যপ্রবাহে সরিষা, শিম ও ডাল জাতীয় ফসলের পরাগায়ণ ব্যাহত হয় এবং ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়। শৈত্যপ্রবাহের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে অনেক ফসল, বিশেষ করে গমের পরাগায়ণ ও গর্ভধারণ না হওয়ায় আংশিক বা সম্পূর্ণ ফসল চিটা হয়ে যায় এবং ছত্রাকের আক্রমণে আলুর লেট ব্লাইট (Late blight) রোগের প্রকোপ দেখা দেয় এতে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে আক্রান্ত এলাকার সমস্ত গাছ সম্পূর্ণভাবে মারা যেতে পারে। একই কারণে আমের মুকুল নষ্ট হয় ও নারিকেলের ফল ধারণ ব্যাহত হয়।

খরা ও লবণাক্ততার প্রভাব:

উজান থেকে পানিপ্রবাহে বাধা এবং নদীতে পানির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা লবণাক্ততায় ভরে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পরিমিত বৃষ্টিপাতের অভাবে আরও বেড়ে যাবে। দেশের মোট উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৫৩ শতাংশ জমি বর্তমানে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে লবণাক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর। তার মধ্যে মাত্র ২ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে লবণসহিষ্ণু ফসল চাষাবাদ সম্ভব হচ্ছে। বাকি জমি এখনও চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। লবণাক্ততার কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিপুল পরিমাণ জমিতে স্বাভাবিক কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে নতুন বিপদ হাজির হয়েছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া। গত কয়েক দশকে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে সেচের পানির ব্যাপক ঘাটতি তৈরী হয়েছে এবং যাত্রা শুরু হয়েছে দেশের উত্তরাঞ্চলের মরুকরণ প্রক্রিয়ার। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মতে রাজশাহীর উচ্চ বরেন্দ্র এলাকায় ১৯৯১ সনে পানির স্তর ছিল ৪৮ ফুট, ২০০০ সনে তা নেমে আসে ৬২ ফুট এবং ২০১৫ পর্যন্ত পানির স্তর নেমে গেছে প্রায় ১০০ ফুটে, এর ফলে শস্য উৎপাদনে খরার প্রভাব বাড়ছে। বেশির ভাগ সময় প্রাক-বর্ষাকাল এবং বর্ষা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে খরার প্রভাব দেখা যায়। অন্যান্য ফসলের (সব রবি ফসল, আখ, তামাক, গম ইত্যাদি) পাশাপাশি বহুবর্ষজীবী ফলদ ও বনজ উদ্ভিদ যেমন বাঁশ, সুপারি, লিচু, আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি ফসলগুলো খরার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, জলবায়ুর পরিবর্তন আগামীর কৃষি কার্যক্রমকে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তাকে ব্যপক ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে।

National Agricultural Research System (NARS) এর গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, জনসংখ্যা বর্তমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আগামী ২০২৫ সালে বাংলাদেশের লোক সংখ্যা দাঁড়াবে ১৯ কোটি, প্রতিজন প্রতিদিন ৪৫৪ গ্রাম খাদ্য গ্রহণ হিসেবে খাদ্যের প্রয়োজন হবে ৩ কোটি ১৫ লাখ মেট্রিক টন। আর ২০৫০ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ২৫ কোটি এবং খাদ্য চাহিদা দাঁড়াবে ৪ কোটি ২৫ লাখ মেট্রিক টন। সেই সাথে ২০২৫ সালে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বর্তমানে ৮১ লাখ হেক্টর থেকে কমে দাঁড়াবে ৬৯ লাখ হেক্টরে এবং ২০৫০ সালে দাঁড়াবে মাত্র ৪৮ লাখ হেক্টরে। সুতরাং এত অল্প পরিমাণ চাষযোগ্য জমিতে ৪.২৫ কোটি মেট্রিক টন চাল উৎপাদন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অতএব এখন থেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু উপযোগী অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন ফসলের জাত উন্নয়ন, পুষ্টি সমুন্নত রেখে খাদ্যাভাস পরিবর্তন এবং সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা ব্যতিত বিকল্প কিছু নেই।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে শীতকালের ব্যাপ্তি ও শীতের তীব্রতা দুইই কমে আসছে কিন্তু শৈত্যপ্রবাহের মাত্রা বেড়েছে। ফলাফলসরূপ বেশির ভাগ রবি ফসলেরই স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে ফলনের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মনুষ্য সৃষ্ট কারণও নানাভাবে কৃষি কার্যক্রম ও খাদ্য নিরাপত্তাকে ব্যহত করে। প্রতি বর্ষায় কৃষক তাঁর সম্পদ ও ফসল রক্ষায় প্রাণান্তকর সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। বন্যায়, প্লাবনে আমাদের সম্পদ ও ফসলহানির বেশির ভাগ কারণই মানব সৃষ্ট। প্রতি বছর মানুষের সম্পদ ও ফসল রক্ষায় শতকোটি টাকায় তৈরী দুর্বল বাঁধ যেখানে প্রতিনিয়ত সামান্য বানের পানির তোড়েই ভেঙ্গে যায় সেখানে অজুহাতে সিদ্ধহস্ত কর্তারা বাঁধ ভাঙ্গার জন্য ইঁদুরের উপর দায় চাপিয়ে মুখ রক্ষার চেষ্টায় থাকেন, যেন অনেকটা 'লাখ টাকার বাগান খাইল দুই টাকার ছাগলে' অবস্থা।

আড়াই হাজার বছর আগে যখন আকাশে স্যাটেলাইট ছিল না, উটের গ্রীবার মতো উন্নয়নের গর্ব ছিল না, ঢেকুর তোলা মধ্যম আয়ের দেশ ছিল না, সে রকম এক দিনে গুরু শিষ্যকে ডেকে বললেন, 'বান ডেকেছে, আমার খেতে পানি ঢুকছে। যাও, জমির আল বেঁধে দিয়ে আসো।' শিষ্য, যার নাম অরণি, সে পানির তোড়ের মুখে যে মাটিই দেয়, ভেসে যায়। ব্যর্থ হয়ে সেখানে শুয়ে পড়ে শরীর দিয়ে বাঁধ দেয়। এ গল্প মহাভারতের হলেও সত্যি।

সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের সময় নোয়াখালীর হাতিয়ার সোনাদিয়ায় এ রকম অজস্র গ্রামীণ অরণিকে দেখা গেল। সারাটা দিন পানির প্রচন্ড ধাক্কা বাঁশ, লাঠি-কাঠি আর শরীর দিয়ে ঠেকিয়ে তাঁরা বাঁধ বাঁচিয়েছেন, ফসল বাঁচিয়েছেন। এ চিত্র খুলনার উপকুলীয় অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই দেখা গেছে। গত বছর ঘূর্ণিঝড় আম্পানের সময়ও মানুষ এভাবে সংগ্রাম করেছে। বিজ্ঞান যখন পুঁজিবাদের দখলে, যেখানে জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনে আবির্ভাব হচ্ছে নিত্য নতুন ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মোকাবেলায় মানুষ একপ্রকার অসহায়। সেখানে এখনই সচেতন না হলে এবং সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে নিকট ভবিষ্যতে আমাদের চরম খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হতে হবে যা আমাদের সমাজিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনবে। ইতিহাসের অন্ধকার যুগ কখনো বিউগল বা সানাই বাজিয়ে আসে না। তা আসে নিরবে, যেভাবে নিঃশব্দে তলিয়ে যায় চোরাবালিতে পা দেওয়া মানুষ যে টের পায় না তার সমূহ মৃত্যু। সময়মত সঠিক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে জলবায়ুর পরিবর্তনে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও খাদ্য সংকট এক সময় আমির-ফকির সকলকেই টেনে নিয়ে যাবে নিঃশব্দ চোরাবালিতে।■

● লেখক : সহকারী কর্মকর্তা, কৃষি বুরো বাংলাদেশ

আধুনিকায়ন ও নান্দনিকতা অবকাঠামো উন্নয়নে বুরোর অগ্রযাত্রা

মো. মুকিতুল ইসলাম

বুরো বাংলাদেশ সৃষ্টিশীল কাজে বিশ্বাসী। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানসহ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সংস্থাটি বিগত তিন দশক ধরে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে কেন্দ্র পর্যায়ে রয়েছে স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি, সাথে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের উপর প্রশিক্ষণ। বুরো বাংলাদেশ এর সদস্যদের ঋণ হিসাব যথাযথকরণ ও লাভ-ক্ষতি নিরূপণে কেন্দ্র পর্যায়ে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসির উপরও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এসব কর্মসূচি অন্যান্যদের থেকে ব্যতিক্রমধর্মী ও আলাদা ধরনের। দেশের অনেক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করলেও বুরো বাংলাদেশ তার মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচির পাশাপাশি বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নামে নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করছে।

এ সকল স্থাপনা নির্মাণে প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকে কম ব্যয়ে নান্দনিক ভবন নির্মাণে কাজ করে চলেছে। অবকাঠামো নির্মাণে সংস্থার লক্ষ্য 'Quality Goods Through Reasonable Pricing' অর্থাৎ সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপত্য নক্সা প্রণয়নে সীমিত ব্যয়ে কিভাবে নান্দনিক অথচ টেকসই ভবন নির্মাণ করা যায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়। প্রতিটি ভবন সবুজ অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব। ইতোমধ্যে মধুপুর, ফরিদপুর, কুমিল্লার ভবন নির্মাণ শেষ হয়ে তা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে। বগুড়া, রংপুর, নোয়াখালীর কাঠামো নির্মাণ শেষ হয়েছে। বর্তমানে এ তিনটি ভবনের অভ্যন্তরীণ কাজ করা হচ্ছে। ভবনগুলোর কাঠামো নির্মাণের আগে একদিকে যেমন স্থাপত্য নক্সা পরিমার্জন করা হয়, তেমনি স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক ও প্লাম্বিং নক্সাও চূড়ান্ত করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রধান স্থপতি কর্তৃক তার টিম নিয়ে পরিবর্তন ও পরিমার্জন শেষে চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি তার সকল অবকাঠামো নির্মাণে সবসময় গুণগত ও মানসম্পন্ন উপকরণ ব্যবহারে সচেষ্ট। ব্যয় সীমিত রাখাসহ গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিষ্ঠানটি অবকাঠামো নির্মাণে ঠিকাদার নিয়োগ না করে নিজস্ব নির্মাণ টিমের তত্ত্বাবধানে দেশের খ্যাতনামা ব্র্যান্ডের সিমেন্ট ও রড কোম্পানির সাথে কর্পোরেট চুক্তির আওতায় সাশ্রয়ী মূল্যে

সরাসরি ফ্যাক্টরি থেকে সংগ্রহ করে। একই সাথে পাথর ও বালি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে উৎসস্থল থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি ভবনের নান্দনিকতাসহ গুণগত মান বজায় রাখার প্রয়োজনে প্রতি মাসে নির্মাণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্থপতি ও তার টিম, কাঠামো প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্টগণ প্রতিমাসে সাইট ভিজিট করেন।

ভবনের প্রাথমিক নক্সা প্রণয়নসহ প্রতিটি কাজের সাথে ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিগণ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থেকে নক্সা প্রণয়ন ও ভবনগুলির সৌন্দর্য বর্ধনে বিভিন্নভাবে প্রধান স্থপতিকে পরামর্শ প্রদান করে তা চূড়ান্ত করার পরই ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু ও শেষ করা হয়। সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও তাঁর সহযোগীগণ অবকাঠামো নির্মাণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিমাসে সকল স্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শন করে তার সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। ভবনের অবকাঠামো নির্মাণে স্পেস ব্যবহার, আলো-বাতাস প্রবেশ, ভবনের ভেতর-বাইরে সবুজের সমাহার নিশ্চিতকরণে নির্মাণ সংশ্লিষ্ট টিম বার বার সাইট পরিদর্শন করে তার যথাযথকরণ নিশ্চিত করেন।

সংস্থার অবকাঠামোগুলোর সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি ভবনের ল্যান্ডস্কেপিং এবং কমফোর্ট জোন, যা মানুষকে ভেতরে প্রবেশে আকর্ষণ করে। অনন্য সৌন্দর্যমন্ডিত প্রতিটি অবকাঠামোর সামনে-পেছনে খেজুর, নারিকেল, নাকাচুয়া, পামসহ সৌন্দর্যবর্ধক বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ দিয়ে সাজানো হচ্ছে এ অবকাঠামো প্রাঙ্গণ। লতাগুল্ম দিয়ে ভরে দেয়া হচ্ছে ভবনের কার্নিশ ও বেলকনিগুলো। প্রতিষ্ঠানটির ভবনগুলোতে আধুনিকতার ছোঁয়া এসেছে প্রতিটি ভবনের দেয়াল ও ছাদে স্টিল ও এলুমিনিয়াম লোবার ব্যবহার করায়।

নির্মাণ বৈশিষ্ট্যে প্রতিটি ভবনের অবকাঠামো ভিন্ন প্রকৃতির। কুমিল্লা মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের চেয়ে বগুড়া কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ অন্যরকম। বগুড়া ভবনটিতে ২টি আন্ডার গ্রাউন্ড পার্কিংসহ উপরের প্রতিটি তলায় আলো প্রবেশে প্রচুর খোলামেলা জায়গা রাখা হয়েছে। সামনে পেছনে ব্রিজসহ ওয়াটার বডি। রংপুর ও নোয়াখালী জমির পরিমাণ হিসাব করে সে অনুযায়ী আধুনিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

ঠাকুরগাঁওয়ে ওয়াটার বডি ঘিরে রয়েছে দ্বিতল আঞ্চলিক অফিস, ত্রিতল ডরমেটরি, ক্যাফেটেরিয়া ও কটেজ। যশোর ও বরিশালের ভবন দুটি একটু ভিন্ন ধরনের।

এ প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো টাঙ্গাইল শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দক্ষিণে। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশাল স্থাপনা। প্রথম পর্বে মূল ভবন, রেস্টুরেন্টসহ আনুষঙ্গিক কাজগুলো শেষের পথে। এর সাথে চলছে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ে কটেজ, স্টাফ কোয়ার্টারসহ ১৫০০ আসন বিশিষ্ট একটি ব্যাঙ্কুয়েট হল। আধুনিক নির্মাণ শৈলীর আট তলাবিশিষ্ট এ ভবনটিতে রয়েছে ২০০-৫০০ জন বসার উপযোগী সুপরিসর ৪টি পৃথক হল রুম। রয়েছে ৭টি প্রশিক্ষণ কক্ষ, ১১৭টি আবাসিক কক্ষ। স্থাপনার সামনের ওয়াটার বডিতে ফোয়ারা ও প্লান্টার বক্সে বড় বড় নারকেল গাছ। চতুর্থ তলার উপরে রয়েছে ওয়াটার বডি ও বাদাম গাছ দিয়ে সজ্জিত প্লান্টার বক্স।

গ্রামীণ পরিবেশে সবুজে ঘেরা এ কমপ্লেক্সটি কম খরচে নান্দনিক স্থাপনা তৈরির একটি অনন্য উদাহরণ হতে পারে। সংস্থার প্রতিটি স্থাপনার ছাদে রয়েছে ক্যাফে, পুল ক্যাফেসহ রয়েছে উন্মুক্ত বসার স্থানও। বুরোর সদস্য, কর্মরত কর্মীবাহিনীসহ দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশি-বিদেশি ব্যাংক, মোবাইল কোম্পানি, ওষুধ তৈরি ও বিপণন সংস্থাসহ দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সুলভ মূল্যে এসব স্থাপনা ব্যবহার করতে পারবে।■

● প্রধান, অবকাঠামো উন্নয়ন
বুরো বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা

মাহমুদ কামাল

জীবনের সিংহভাগ সময় কারাগারে ছিলেন। জেল জীবন কারোর জন্য সুখের নয়। নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনে যখন প্রায় সবাই অভ্যস্ত তখন তিনি জাতিকে মুক্ত করার জন্য স্বাভাবিক জীবন ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর মুখে ছিলেন দুইবার। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং ২৫ শে মার্চ ইয়াহিয়া বাহিনীর হাতে বন্দীজীবন। জনগণের ভালোবাসা তাঁকে মুক্ত করেছে। এই জনতাই তাঁকে আখ্যা দিয়েছে, 'বঙ্গবন্ধু' বিশেষণে। তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু ১৫ই আগস্ট এই জাতিকে পিছিয়ে দিয়েছে বিভ্রান্তকারী কিছু সৈনিক। সাথে ছিল দেশি-বিদেশি নানা চক্রান্ত। এগুলো আমাদের জানা কথা। আমরা সবাই কম বেশি জানি। হৃদয়ে এখন জায়গা জুড়েই বঙ্গবন্ধু। এখান থেকে কোনও ভাবেই তাঁকে সরানো যাবে না।

অনেকেই বলেন ৭ই মার্চের বক্তৃতা একটি চমৎকার কবিতা। মনে আছে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যখন এই কালজয়ী বক্তব্য প্রদান করেন তখন আমি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। পরদিন অর্থাৎ ৮ই মার্চ রেডিওতে সেই ভাষণ প্রচার করা হয়। ভাষণটি শুনে কিশোরের শরীরের সমস্ত রোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে কী যে উদ্দীপন! এখন এই ভাষণ, এই জাতীয় সম্পদটি প্রচারের একটু নিয়ম করা প্রয়োজন। যেখানে সেখানে যত্রতত্র এই মহাকবিতাটি বাজানোর কারণে নিজের কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় এর গুরুত্ব কমে যাওয়ার বিষয়টি। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কি যেখানে সেখানে গাওয়া হয়? বিধিবদ্ধ নিয়মে যখন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তখন আমরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করি। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতার আহ্বান। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভাষণের মর্যাদা রক্ষা করা ভীষণ জরুরি। আবার ভাষণটি জাদুঘরেও বন্দি করে রাখা যাবে না। এই ভাষণ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখন প্রচারের ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়মের মধ্যে আনতে পারলে এর মর্যাদা রক্ষা পাবে বলে মনে করি। এই ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্টের পর শুরু হয়েছে ইতিহাস বিকৃতি। বহুদিন বঙ্গবন্ধুর নাম মুখে নেয়নি রাষ্টযন্ত্র। ভয়ে অনেক 'বঙ্গবন্ধু'র অনুসারীও প্রকাশ্যে নাম উচ্চারণ করতেন না। বর্তমানে 'হাইব্রিড' নামে একটি শব্দ চালু হয়েছে। আজ বঙ্গবন্ধু প্রেমিকের ছড়াছড়ি। সুবিধাভোগীদের মুখে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণে প্রকৃতরা এখন পিছিয়ে পড়েছে। এখন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখা হচ্ছে। ১৫ই আগস্টের পর এদের কলম ছিল বন্ধ। অহংকার করে নয়, সত্য উচ্চারণে বলতে চাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম ১৯৮৫ সালে। কবিতাটি অসংখ্য কাগজে ছাপা হয়েছে। সর্বশেষ এবছর বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে কবিতাটি মাথা উঁচু করে রয়েছে। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না।

বঙ্গবন্ধু আমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন

লুকানো নদীর তীরে এসে নদীকে শুধালাম
তোমার বুকে স্রোত নেই কেন?
এ কথায় সামান্য বাতাসে অসামান্য নীরবিন্দু
কেঁপে ওঠে
আমি তার অর্থ করি এভাবে:
তিনি নেই তাই আমিও শুকিয়ে গেছি।
অটবি আমাকে উদারতা শিখিয়েছে
তার কাছে গিয়ে বলি, তোমরা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছ কেন?
আবারও মৃদ্ বাতাস
আমি তার অর্থ করি এভাবে:
তিনি নেই তাই আমরাও ফাঁকা হয়ে যাচ্ছি।
আমি বঙ্গবন্ধুর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলি
আপনিতো নেই, কে আমাকে এসব ফিরিয়ে দেবে?
আমি ফিরে পেতে চাই স্বর্ণগ্রাম, কাখের কলস
পাখির কাকলিসহ সবুজাভ ফিরে পেতে চাই।
ছবিটি মুচকি হেসে ওঠে
আমি তার অর্থ করি এভাবে:
পাবে, সব কিছু পাবে, আমি নেই তাতে কি
তোমরা তো আছো।
আমি তোমাদের মাঝে মিশে আছি বলে
আমাকে এখনো পৃথক করতে পারেনি কোনও ঝড়
ধৈর্য ধরো, সব কিছু পাবে।

বঙ্গবন্ধু আমি প্রতীক্ষায় রইলাম।

প্রতীক্ষা আমাদের শেষ হয়নি। আমরা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা দেখতে চাই। এ প্রত্যাশা তাঁর কন্যার কাছেই।■

স্বাধীনতার অর্ধশতক, দুর্যোগ সহিষ্ণু বাঙালি জাতির উত্থান

ড. ফাতিমা ইয়াসমিন

বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। নদীবিধৌত এই গাঙ্গেয় বদ্বীপটি যুগে যুগেই বহিঃশক্তির আক্রমন, শাসন ও শোষণের শিকার হয়েছে। সেইসাথে ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বারে বারেই এ অঞ্চলের মানুষ ঘুড়ে দাঁড়িয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে সব ধরনের দুর্যোগকে মোকাবিলা করে।

দুর্যোগ মূলত দুই ধরনের– প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানব সৃষ্ট দুর্যোগ। প্রাকৃতিক ভাবে সংঘটিত দুর্যোগ এর মধ্যে বন্যা, খরা, পাহাড়ি ঢল, লবণাক্ততা, নদী ভাঙ্গন, ঝড়, জলোচ্ছাস, টর্নেডো, সুনামী, বজ্রপাত, দাবানল, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, আর্সেনিক দূষণ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এগুলো প্রকৃতিক দুর্যোগের অর্ন্তভুক্ত। অন্যদিকে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সন্ত্রাস, জীবাণু ও রাসায়নিক আক্রমন, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, লুটতরাজ এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও দুর্ঘটনা এর সবই মানবসৃষ্ট দুর্যোগের আওতায় পরে যায়।

এ অঞ্চলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, বাংলার আদিম অধিবাসী ছিল অষ্ট্রিক ভাষাভাষী লোক। প্রাচীন সাহিত্যে এদেরকে নিষাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলার আদিবাসী সাঁওতাল ও লোধাদের মধ্যে এর শারীরিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসবিদের মতে বাংলায় প্রথম অনুপ্রবেশ করে দ্রাবিড়রা। এবং সমসাময়িক সময়েই আর্যরাও আসে। এদেরই একটি দল এশিয়া মাইনর থেকে অগ্রসর হয়ে সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, তামিলনাড়ু পার হয়ে আরও পূর্ব উপকূল হয়ে বাংলা ও ওড়িশায় বসতি স্থাপন করে। এভাবেই ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে মানুষের বসতি শুরু হয়। কালের পরিক্রমায় যা আজকের বাংলা।

বলা যায়, বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের বীজ প্রথম বপণ করেছিলেন মহাভারত বর্নিত নিষাদপুত্র 'একলব্য'। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একলব্য পান্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় একলব্যকে বাঙালি জাতির স্বরাজ অর্জনের প্রথম মানসপুত্র বলা যায়।

৫৯০ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি মহাসামন্ত শশঙ্কের উত্থান ঘটে। তাঁর সময়কালে (৫৯০-৬২৫) বাংলা স্বাধীনই ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এ অঞ্চলে 'মৎস্যন্যায়ের' উদ্ভব ঘটে। এসময় রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একই সময় দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, এই দুর্ভিক্ষ অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল।

কম্বজ দেশ বা আফগানিস্তান থেকে আসা গোপালদেব ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন। বাংলা তখন 'গৌড়বঙ্গ' নামে গৌড়ের অংশ ছিল। পাল শাসনকাল সাড়ে চারশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। গোপালের রাজত্বকালে বাংলাভাষার সৃজনকালের সূচনা হয়। এসময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, সোমপুর বৌদ্ধবিহারসহ বহু বৌদ্ধমন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বলা যায় বাংলায় প্রথম জনবিদ্রোহ ঘটেছিল পাল আমলের শেষ দিকে যা 'কৈবত্য বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। কৈবত্য বিদ্রোহ বাঙলার স্বরাজ অর্জনের একটি স্বত:স্ফূর্ত প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষণ সেন গৌড় সিংহাসনে বসেন। ১২০৪ মতান্তরে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে লাহরের শাসক মহাম্মদ বিন ঘোরীর একজন রাজ কর্মচারী মাত্র সতের জন ঘোড় সওয়ার নিয়ে রাজা লক্ষণ সেনকে বিতারিত করে এ অঞ্চলের সিংহাসন দখল করেন।

এরপর পর্যায়ক্রমে মোগল শাসন, ইংরেজ শাসন এবং সর্বশেষ পাকিস্তানি শাসন কাল। মুঘল শাসনামলে বড় কোনো বিদ্রোহের কথা জানা যায় না। তবে মুঘল যুগে প্রায়ই বন্যা ও খরার জন্যে কৃষকদের খুবই বিপাকে পরতে হতো। এজন্যে মুঘল শাসকগণ এ অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। যা ছিল সমকালীন ইতিহাসে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ও পরিবেশ বান্ধব।

মুঘল আমলে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলায় মগ দস্যুদের উৎপাত অনেক বেশি বেড়ে যায়। এসময় সুবাদার শায়েস্তা খানকে বাংলায় নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মগ দস্যুদের দমন করেন। এসময় প্রচুর চাল আমদানি করা হয়। তখন এক টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেতো। শায়েস্তা খান ওরফে মির্জা আবু তালিব ১৬৬৩ সাল থেকে ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মোট বাইশ বছর বাংলায় অতিবাহিত করেন। তাঁর সময়ে শহরতলীসহ ঢাকা শহর টঙ্গী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ঢাকায় বহু ইমারত, রাস্তাঘাট এবং মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। শায়েস্তা খানের সময়কালকে বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় যুগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রথম থেকেই বাংলার নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পায়তারা শুরু হয়। শুরু হয় সীমাহীন শোষণ। কৃষকদের জোরপূর্বক নীল চাষ, তাঁদের নীলকুঠিতে কাজ করতে বাধ্য করার এক পর্যায়ে নিঃস্ব কৃষকদের মধ্যে থেকে শুরু হয় নীল বিদ্রোহ (Indigo Revolt), এর সাথেই চলমান ছিল ফকির সন্ন্যাসীদের আন্দোলন। হাজী শরীয়তউল্লার নেতৃত্বে বিদ্রোহ, তিতুমীর এর বাঁশের কেল্লা , সিপাহী বিপ্লব (Indian Rebellion 1857), সূর্যসেন এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন সবই বাংলার মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক একটি মাইল ফলক।

ব্রিটিশ শাসনকালে এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি দুর্যোগ ঘটেছিল। এরমধ্যে ১৭৬৯ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৮৬৪ সালের কোলকাতা সাইক্লোন, ১৮৭৬ সালের বাকেরগঞ্জ সাইক্লোন, ১৮৯৭ সালের আসাম ভূমিকম্প, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ এবং ব্রিটিশ শাষণের শেষ দিকে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের ভয়াবহ দাঙ্গা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব দুর্যোগে অনেক মানুষ হতাহত হয়েছিলেন এবং বহু সম্পদ বিনষ্ট হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের পর শুরু হয় পাকিস্তানি শাসনকাল। ব্রিটিশ শাসনের ধারাবাহিকতায় এখানেও শুরু হয় শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার ইতিহাস, বাঙালি মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির উপর চরম আগ্রাসন। আবারও বাংলার মানুষ গর্জে ওঠে মাতৃভাষা রক্ষার দাবীতে, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং সম্পদের সুষ্ঠ বন্টনের দাবিতে। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলন যা পরর্বতীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নেয়।

পাকিস্তানী শাসনামলে ১৯৫৪ সালের ১৫ই মে আদমজী পাটকলে বিহারী-বাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা বেধে যায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান শপথ গ্রহণের পরপরই সেখানে ছুটে যান। সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আহত তিনশর বেশি মানুষকে তিনি হাসপাতালে পাঠান এবং পাঁচশতাধিক মৃতদেহ গণনা করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা ও নারায়রণগঞ্জ এ ভয়াবহ দাঙ্গা সংগঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে নড়রাইলে একটি ভয়াবহ টর্নেডো আঘাত হানে, ১৯৬৮ সালে ১৪ এপ্রিল একই দিনে দুইটি বিধ্বংসী টর্নেডো আঘাত হানে। একটি ঢাকার অদূরে ডেমরা এলাকায়, অন্যটি কুমিল্লার হোমনায়। এতে বহু প্রাণহানি ঘটে সম্পদের অনেক ক্ষতি হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম প্রধান বিধ্বংসী সাইক্লোন হিসাবে বিবেচিত ১৯৭০ সালের সাইক্লোন ১২ই নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে। যা ভোলা সাইক্লোন নামে খ্যাত। এতে পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ প্রাণ হারান এবং সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তজুমুদ্দীন উপজেলা। এখানে ১,৬৭,০০০ জনের প্রাণহানি ঘটে যা ঐ এলাকার মোট জনসংখ্যার ৪৫%। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানীসহ সব জাতীয় নেতাগণ তৎক্ষনাৎ উপকূল অঞ্চলে ছুটে গিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়ান ও ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। এসময় পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সরকারের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য পরিচালনায় অদক্ষতা ও অসহযোগিতামূলক আচরণে বিশ্বজুরে সমালোচনার ঝড় উঠে।

তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের জনগণ এই দুর্যোগকে মোকাবেলা করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করলেও ক্ষমতাসীন ইয়াহিয়া সরকার আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করতে থাকে। অন্যদিকে একই সময়ে তারা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে অস্ত্রের মজুদ এবং সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে থাকে।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এবং ঘুমন্ত নিরীহ বাংলার জনগণের উপর চালানো হয় ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ। যার নাম 'অপারেশন সার্চলাইট'। ঢাকায় ঘুমন্ত নগরবাসীর উপর কামান দিয়ে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এরপর একে একে ইপিআর সদর দফতর, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন সহ পুরান ঢাকা, আক্রমণ করে। মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইন মনে করেন ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় আনুমানিক সাতহাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এবং তিন হাজার মানুষকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সব বড় শহরগুলো আয়ত্বে নেয় এবং সমগ্র দেশ জুড়েই নিরীহ, নিরস্ত্র বাংলার জনগণের উপর ঝাপিয়ে পরে।

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম প্রধান বিধ্বংসী সাইক্লোন হিসাবে বিবেচিত ১৯৭০ সালের সাইক্লোন এটা ১২ই নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে। যা ভোলা সাইক্লোন নামে খ্যাত। এতে পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ প্রাণ হারান এবং সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ঢাকা শহরে প্রথম প্রতিরোধ হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। রাত ১১.৪৫ মিনিটে ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি ট্যাংক বহর রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করলে উপস্থিত পুলিশ সদস্যগণ তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের সীমিত অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যদিও তাঁরা ভারী অস্ত্রে সুসজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে তাঁদের থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল দিয়ে সাড়ে তিন ঘন্টাব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরপর তাঁরা আর টিকে থাকতে পারে নাই। তবুও তাঁরা প্রাণপণ লড়াই করে যায়। দেড়শর বেশি পুলিশ সদস্য এসময় প্রাণ হারান। এটাই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ।

এর পরের ইতিহাস সবারই জানা, নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, তিরিশ লক্ষ শহীদ ও চারলক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলার মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে। হাজার বছর পরে বাংলার মানুষ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় যার নাম বাংলাদেশ।

নদীবিধৌত জল-জঙ্গলে ঢাকা বাংলার এ পাললিক সমভূমি সবসময়ই ছিল অত্যন্ত উর্বর ও সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। সচ্ছল এ জনগোষ্ঠী ছিল মানবিক গুণাবলীতেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ জনপদের মানুষের মধ্যে প্রেম ছিল, উদারতা ছিল, আতিথেয়তা ছিল আর ছিল সীমাহীন সরলতা।

ইতিহাসের এক একটি পর্যায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহিরাগত মানুষ মূলত বণিক, পর্যটক এবং ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই জনপদে এসেছে। সম্পদের লোভে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আসা এই বহিরাগত বণিক শ্রেণীই একসময় এদেশের মানুষের সরলতা ও আতিথেয়তার সুযোগ নিয়ে এদেশের মানুষকে শাসন করেছে, শোষণ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে এ জনপদের অধিবাসীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সাথে নিজেদের স্বাধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে। অবশেষে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নয়মাস রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে। উত্থান হয় একটি দুর্যোগ সহিষ্ণু সাহসী বাঙালী জাতির।■

● লেখক : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জাতিগত অধিকার বিষেশজ্ঞ।

একশত বছর পর

বিমল গুহ

একশত বছর পার হলো
তুমি একবারও উঠে দাঁড়ালে না
অন্ধকার ভেদ করে সেই কবে সূর্য জ্বলেছিলো
মধ্যরাতে আমার আকাশে
তখন নিদ্রামগ্ন ছিলো পৃথিবীও
তখন তন্নতন্ন করে খুঁজি গুল্ম, খুঁজি তৃণলতা–
সর্বত্রই নুড়ির বিস্তার সর্বত্রই পাথরের স্তূপ
কৃষ্ণগহ্বর থেকে উদগিরিত ধূম্রকুণ্ডলী;
পদার্থের অণুর সংঘাতে জ্বলে উঠেছিলো আলো
তখন আকাশ উজ্জ্বল ক্রম-বহ্নিমান।

আজ এতকাল পর দুহাজার একুশের ঊষালগ্নে
চৈতন্যে ফিরে পাই
ঝিম ধরে বসে আছি পোড়খাওয়া তপ্ত বায়ুমণ্ডলের ভেতর
তুমি উঠে দাঁড়ালে না।
আকাশ কি বুঝতে চায়নি একবারও
প্রাচীন রূপকথার বুনন কত গভীরে প্রোথিত
দেখতে চায়নি পাথরের স্তূপাকৃতি কার্বনের রূপ।
আর কতকাল পর সূর্যালোকের মতন
জ্বলে উঠবে নবতর আলো
আমার উঠোনে।
সেই থেকে বসে আছি গিরিশৃঙ্গের কন্দরে
একশত বছর পর যদি জীবাশ্ম থেকে
আরবার জ্বলে ওঠে আলো।

রমাকান্ত কামার

মুজিবুল হক কবীর

বহুদূর চলে গেছে আড়ালে থাকা চোখ তার
ঝুলবারান্দায় একাকী দাঁড়িয়ে দেখে,
মেঘের চিতা আকাশসীমা দিচ্ছে পাড়ি
কোয়ারি-বাগানে ছোট্ট চারা উঠছে বেড়ে
বেতসের মতো লতিয়ে ওঠা হাতটি নেড়ে,
অদূরে পদ্মপুকুর
সকাল-দুপুর মানুষের ছায়া
ডুবে যায় জলে
কিছুই থাকে না করতলে।

রমাকান্ত ভাবে, কষ্টসৃষ্ট-পর্ব থেকে
পর্বান্তরে কেমন করে দাঁড়িয়ে আছি;
জীবনমুখী কর্মযজ্ঞের কাছাকাছি।

তখন ছিল না শরতের আকাশ
ছিল না বসন্ত হাওয়া
ছিল না ভ্রমণপিপাসু মন, দূর দূরান্তে কোথাও যাওয়া
ছিল না প্রেমপুষ্পময় দিন
ছিল না জীবন রঙিন।

প্রাতরাশ
শাহানা মাহবুব

সে আর আমি বসেছিলাম প্রাতরাশে
ধূমায়িত কফির কাপে দিচ্ছি চুমুক কী আবেশে!
ভাবনাগুলো ধোঁয়ার সাথে হারিয়ে গেল দূরের পথে
জানালাজুড়ে কাঁপছিল রোদ একলা একা
সে আর আমি দু'জন ছিলাম পান্থসখা;

দু'জন যেন একলা ছিলাম দুই ভুবনে
সে আর আমি একলা ছিলাম নিজের খেলায়
আমার মাথায় রোদ ছিল না মেঘ ছিল না
মাথায় তখন কড়া কফির উগ্রকড়া ফিলোসফি
দু'জন ছিলাম মগ্ন তখন– ভাবনাগুলো কল্পতরু;

প্রাতরাশে বসেছিলাম সে আর আমি
খাবার ছিল টেবিল ভরা বাজছিল গান রাজেশ্বরীর
কফির ধোঁয়া উগ্রকড়া অথবা তা পানসে মলিন
কোনো কিছুর বোধ ছিল না– বাজছিল সেই পুরনো দিন
কফির কাপের ধোঁয়ার মতোই ভাবনাগুলো
একলা ছিল–একলা ছিল এলোমেলো।

মমতার জন্য বাঙাল সনেট
নূরুল হক

আলোর কলমে লিখি তার কথা লিখি শ্রদ্ধাভরে
সাক্ষী আছি আমি তুমি অস্তগামী স্বর্ণ-সূর্যশিখা
বঙ্গের রাখাল সেতো বঙ্গ পাল প্রতি ঘরে ঘরে
জ্বেলে দেন সবিস্ময়ে সপ্তসিন্ধু রজতের টিকা।

জনক প্রমীলেশ্বর, মা জননী নিজে আজ তুমি
স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত পিতার সান্নিধ্য
আপন উদরে তুমি ধরে আছো শ্যাম পূণ্যভূমি
আমার জননী তুমি ভগ্নি তুমি অয়োময় ঋদ্ধ।

কে বলেছে নেতা তুমি পদচুমি স্নিগ্ধ ধরাতলে
মিশে থাকো জনারণ্যে হন্যে হয়ে ছুটে যাও একা
তোমার শ্রমের ফল কখনোবা যায়নি বিফলে
বাঙলার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পাই তার দেখা।

আলোর কলমে তাই লিখে যাই লিখি শ্রদ্ধাভরে
নিয়ত সাফল্য গাঁথা লিখে রাখি অক্ষরে অক্ষরে।

দ্রৌপদী
এ কে শেরাম

হস্তিনাপুরের রাজসভায় যখন
অন্ধ রাজশক্তি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে উদ্যত
যখন দুর্যোধনের ধর্ষকাম ইচ্ছের বাস্তবায়নে
অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের একান্ত প্রশ্রয়ে
ধর্মের ধ্বজাধারী ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদূরের
আর বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদের অসহায় আত্মসমর্পণে
দুঃশাসন টেনে ধরেছিল দ্রৌপদীর শাড়ির আঁচল
তখন– দ্রৌপদী নয় নির্বস্ত্র হয়েছিল সমস্ত কুরুকূল।
আহত সাপের মতো ফণা উঁচিয়ে
দ্রৌপদী হিসহিসে কণ্ঠে উদ্ধত দাঁড়িয়ে বলেছিল–
আমি কোনো রাজরাণী নই
কারও কূলবধূ নই আমি, নই কারো স্ত্রী
আমি নারী, কেবলই এক আহত নারী।
তার কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল
পুরুষবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধিক্কার–
চোখেমুখে ছিল এক প্রচণ্ড ঘৃণা।
দ্রৌপদীর ভেতরে সেদিন জেগে উঠেছিল
চিরায়ত সেই বিদ্রোহী নারী।
তাই তার ক্রোধের আগুনে পুড়ে
ধ্বংস হয়েছিল সমগ্র আর্যাবর্ত,
ধ্বংস হয়েছিল পুরুষতন্ত্রের সমস্ত অহংকার।

তারপর সব অন্যায় অন্ধকার পুড়ে পুড়ে
জন্ম নিয়েছিল এক নতুন পৃথিবী।

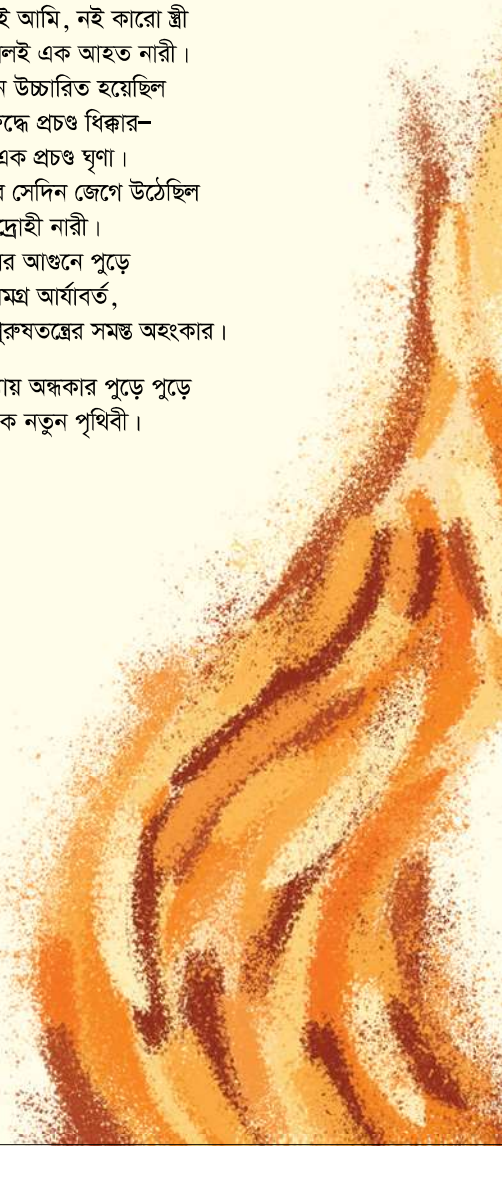

রক্তের দাগ শুকায় না
রাশেদ রহমান

বত্রিশ নম্বরের রক্তের দাগ শুকায়নি
অবতীর্ণ সত্য– রক্তের দাগ কখনো শুকায় না–

কুরুক্ষেত্রে এখনো রক্তের দাগ বিদ্যমান; অর্জুনের তীর
বেয়ে নেমে এসেছিল এই রক্ত। লঙ্কায় জ্বলজ্বল করে
বীর মেঘনাদের বুক-ঝরা রক্তচ্ছাপ; ট্রয় নগরী ভাসে
হেক্টর-প্যারিস-হারকিউলিসের রক্তে। আরব্যভূমির প্রতিটি
বালিকণা রঞ্জিত অজস্র খঞ্জরের আঘাতে। এই বদ্বীপের
তেরোশ' নদ-নদীতেও বহমান একাত্তরের রক্তস্রোত...।

রক্তের দাগ স্পষ্ট এখনো পুরো বাংলাদেশ জুড়ে
বত্রিশ নম্বরের রক্তে প্লাবিত বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ...!

প্রেমিক
আমিনুল ইসলাম

গাঁয়ের ছেলে বলে আমিও দেখেছি মাথার ঘোমটা সরায়ে
টর্চ মারা কন্যা দেখার কাল– কিন্তু আমার শেকড় উল্টিয়ে
কি দেখবে বলো! আমি তো একপাত্রেই পান করি জল ও
পানির অধর; সেও অভিন্ন চুমকে; আর আমার কথা নিয়ে
একবার লাল একবার কালো মানে করার কি আছে যখন আমি
কোনো উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে অভ্যস্ত নই? আমি
বিদ্রোহী কবির মতো অভিন্ন– ঘরে বাইরে দিনে রাতে
তিন কালে; অতএব আমাকে ভালোবাসতেই পারো;
কী পাবে? আমাকে ভালোবেসে পাবে একখানা মাটির
উঠোন, যেখানে লাইলি মজনু শিরি ফরহাদ চন্ডিদাস
রজকিনীর পতাকা একসাথে ওড়ে রোজ মাথায় নিয়ে
অভিন্ন আকাশ– যে দৃশ্যের প্রতারক নকল মাঝে মাঝে
ভাড়া খাটে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে; হ্যাঁ, আমার
বাগানটি বড় নয়; কিন্তু সন্ধ্যা এলে এখানেই হেসে ওঠে
মধুবালার গন্ধমাখা চাহারবাগের জোছনা ধোওয়া আকাশ

না, আমার উঠোন সীমান্তে কোনো কাঁটাতরের বেড়া কিংবা
সীমান্ত ওয়াচ টাওয়ার নেই; সেটা দিয়ে কী কাজ প্রেমিকের!

দুঃখরা জমাট বাধে না
মিলু শামস

দুঃখরা জমাট বাঁধে না
অশরীরী ওয়েবে ভাসে
শরীরী ইমেজ
কপোলের ব্লাশন, আইল্যাশ
আইশ্যাডোর ধূসর নীলচে শেড
ইকবাল রোডের সবুজ মাঠের সজীবতা নিয়ে
তাকিয়ে থাকে
ঝলমলে হীরেকুচি দিন
কাটিয়েছিল এখানে সে
ফড়িঙের সঙ্গে উড়ে উড়ে
সিসা আর স্লিপারের কোমল শিহরণে
যখন তরতরিয়ে পেরিয়ে গেছে
বিমুগ্ধ শৈশব কৈশোর
যখন পা রেখেছিল জীবনের সোনালী সিঁড়িতে।

তার বিচ্ছেদ মানতে হয় কষ্ট কল্পনায়
হারানোর হাহাকার বৈশাখী ঝড় হয়ে
ভেঙে দেয় সমুদয় চেনা জনপদ
তবু দুঃখরা জমাট বাঁধেনা
অশরীরী ওয়েবে ভাসে
শরীরী ইমেজ–
উৎসবের সাজে যেমন সেজেছিল সে
চোখের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে
ধূসর নীলচে শাড়িতে।

আয়না
জাহানারা বুলা

তোমার অবয়ব শীতের বিষণ্নতার মতো শীর্ণ
হৃদয়ের পথ ধরে অজস্র ঝরাপাতা'র মর্মর।

নীরবতার আব্রুতে ঢেকে রেখেছো বলা কথা
যা তুমি বলেছিলে এক অনির্মেষ রাতে।

মনে পড়ে–
তোমার প্রতিবিম্ব অজস্র আহ্লাদে ভেঙে পড়তো
আমার বুকে?

আমি সেই আয়না তোমার–
সেখানেই আছি যেখানে স্পষ্ট হতে
বিজয়ী সৈনিকের মতো দৃপ্ত বুকে।

আজ কেন সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি'র মতো অপ্রতিভ তুমি?
তোমার থুবড়ে পড়ার শঙ্কা বুকে তাই তো দাঁড়িয়ে আছি।

পিঠের পারদ খ'সে পড়ার আগেই যে আসতে হবে
না হয়, আমি হবো স্বচ্ছ কাঁচ–
ওপারের ধুধু মরুভূমি দেখে ব্যথিত হবে তোমার বিবেক।

ছোটগল্প

গৃহপালিত চিড়িয়াখানা গড়ে উঠবার প্রণালী

মনি হায়দার

মামা, আপনার শরীর কেমন? মা গতরাতে বলেছে, আপনার জ্বর এসেছে। অফিস থেকে বের হয়ে বাসায় যাইনি। আপনাকে দেখতে চলে এসেছি, বিরতিহীন কথা বলে থামে কামরুল হক। দশাসই শরীরের উপর ছোট একখান মাথা। সেই তুলনায় হাত দুটো বেশ লম্বা। কামরুল হকের শরীরিক কাঠামো দেখে আজব প্রাণী মনে হয়। কিন্তু চোখ মুখ আর মাথার উপর চুল দেখে বোঝা যায়, মানুষ।

শরিফুল আলম মাথা নাড়েন, ভালো।

পাশের সোফায় বসে কামরুল। হাতে বড় একটা ব্যাগ। শরিফুল বুঝতে পারেন, ব্যাগে ফল জাতীয় কিছু আছে। মাথার উপর ফ্যান চললেও দরদর ঘামছে কামরুল। বাড়ির ভেতর থেকে জয়নাল এসে দাঁড়ায়। জয়নালকে দেখে কামরুল একটু রেগে যায়, কি করো তুমি আর তোমার বউ? এই যে মানুষটার জ্বর, কি খায় না খায় খেয়াল রাখা দরকার না তোমাদের?

ওরাইতো আমার সেবা করছে দিনরাত? বিরক্ত শরিফুল, ওকে বকিস কেনো? জয়নাল আর ওর বৌ নাসিমা না থাকলে আমি কবে মরে ভূত হয়ে যেতাম?

হালকা-পাতলা গড়নের মানুষ জয়নাল এখন কি করবে? বাড়ির ভেতরে চলে যাবে? নাকি দাঁড়িয়ে আগন্তুকের অপ্রস্তুত মুখ দেখবে? অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে কামরুলই। জয়নাল মিয়া, ব্যাগটা নাও। হাতের ব্যাগটা বাড়িয়ে ধরে, ব্যাগের ভেতরে কমলা, আপেল আর মালটা আছে। এখনই আমার সামনে মামাকে আপেল আর মালটা কেটে দাও।

জে, জয়নাল ব্যাগটা নিয়ে চলে যাবার সময়ে জয়নালকে উদ্দেশ্যে করে বলেন শরিফুল আলম, আমি না একটু আগে চা খেলাম। আমাকে এখন ফলটল দিস না জয়নাল।

জে, জয়নালের মুখে তেসরা হাসি ফোটে।

কামরুল হক ভালো করেই জানে, আত্মীয়-স্বজন দেখলে খুব বিরক্ত হন মামা। কিন্তু বিরক্ত হলে তো চলবে না। মামা শরিফুল আলমের সাড়ে নয় কাঠার উপর বিশাল সাড়ে তিনতলা বাড়ি। বাড়িটা ঢাকা শহরের ঠিক বুক পকেটে। ডেভেলপারকে দিলে কয়েক কোটি টাকা দেবেই, তার উপর পাওয়া যাবে কমপক্ষে বিশটি ফ্ল্যাট। মামা একা মানুষ। কি করবে এই বিশাল সম্পদ দিয়ে? মামার বয়স এখন সত্তর বছর। মাঝে মাঝে শরীর খারাপ করে ঠিকই কিন্তু আবার উঠে দাঁড়ায়। সব সময়ে মামার পাশে না থাকলে এই বিশাল সম্পত্তি হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে যে কেনো সময়ে। কারণ, বাঘের মতো ওৎ পেতে আছে মামার ছোট ভাইয়ের ছেলে মেয়েরা। সঙ্গে বড় খালার ছেলে মেয়েরাও। অনুমানে বোঝা যায় বড় খালার বড় মেয়ে ঝুমাকে বেশ পছন্দ করেন মামা। ঝুমা এইসব স্বার্থটার্থ বোঝে না। সরকারি বড় চাকরি করে আর মামার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। অবশ্য এই যোগাযোগ সেই শৈশব থেকেই। ছোটবেলা থেকে ঝুমা আপা ন্যাওটা বড় মামার। অনেকের ধারনা এই বিশাল সম্পতির বিরাট একটা অংশ ঝুমা আপাকে দিয়ে যাবে। বড় মামার ছোট ভাইয়ের ছোট ছেলে সজীবও একজন দাবীদার। সজীব ভাই কি যাদু করেছে মামাকে বুঝতেই পারে না কামরুল। সজীব ডাক্তার। রাত তিনটার সময়েও বড় মামার বাসায় হাজির হয়ে যায় প্রেশার মাপার যন্ত্র নিয়ে। ডাক্তারী পেশাটা এই ক্ষেত্রে বড় একটা তুরুপের তাস! শেষ পর্যন্ত ঝুমা আপা সজীব ভাই সব গ্রাস করবে? আর আমি বা অন্যরা চেয়ে দেখবো?

বড় চাচা?

নিজের ভাবনার মধ্যে বিভোর কামরুল হক সামনে তাকায়। দাঁড়িয়ে সজীব ভাই। সজীব ভাইকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শরিফুল আলমের মুখের বিরক্তিভাবটা কেটে যায়। একটা স্নেহমাখা লাবণ্য ফোটে। এতোক্ষণ কামরুল বসে থাকায় ড্রয়িংরুমের গুমোট পরিস্থিতি কাটে।

তুই কোত্থেকে?

আমি আপনার বাড়ির সামনে দিয়েই যাচ্ছিলাম বাসার দিকে। হাতেও সময় আছে। ভাবলাম আপনাকে দেখে যাই–

এসে ভালো করেছিস! বস।

সজীব তাকায় কামরুলের দিকে, কি খবর

কামরুল?
এইতো ভালো। আমিও মামাকে দেখতে এসেছি।
এইভাবে এসে মাঝে মধ্যে দেখে যাওয়া দরকার। বয়স হয়েছে, কখন কি হয় বলা যায় না।
মা তো সেটাই বলে। গতকাল মামাকে ফোন করে মা আমাদের বাড়ি যেতে বললো। মামা কোনোভাবেই রাজি হচ্ছে না।
বড় চাচা? আপনিতো বড় ফুফুর বাসায় গিয়ে কয়েকদিন থেকে আসতে পারেন।
তুই যা বুঝিস না, সে নিয়ে কথা বলিস না– শরিফুল আলম রেগে গেলেন। আমার এতো যত্নের বাড়ি রেখে কোথায় যাবো? বাড়িতে কয়েকটা বিড়াল আছে। ওদেরকে আমি খেতে না দিলে খায় না। আর আমি পড়ি। নানা বই আমার আলমারীতে... ওদের বাসায় কোনো বই আছে?
সেটা একটা কথা। চাচা হেলাল ভাই, বেলাল ভাই, বেণু আপা কেউ কি দেশে আসবে না?
একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বের হয় শরিফুল আলমের, তুই নিজেইতো জিজ্ঞেস করেছিস ওদের। কি বলেছে তোকে?
হেলাল ভাই বরং তোমাকে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যেতে বলেছে। বেলাল ভাই কানাডা থেকে বলেছে– যাবো না কেনো? যবো। কিন্ত কবে যাবো জানি না। বেলাল ভাই আরো বলেছে, মা বেঁচে থাকলে যেতাম। উনি চাচীর খুব ন্যাওটা ছিল। দুই জনেই বাড়ি করেছে। ওই দুই দেশের মেয়ে বিয়ে করেছে– আর ফিরবে দেশে, আমার এমনটা মনে হয়। কিন্তু বেণু আপার কি ইচ্ছে জানি না।
আমার আশা ছিল হেলাল-বেলাল যাই করে করুক কিন্ত বেণু আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। গেলেও ফিরে আসবে। কিন্তু আমার সব আশা ছিল দুরাশা, শরিফুল আলমের গলা ভারী হয়ে আসে।
আমার মনে হয় আপনি উল্টো আশা করেছিলেন বড় চাচা?
কি রকম?
সাধারণত মেয়েরা তো বিয়ের পর জামাইয়ের অধীনস্ত হয়ে যায়। আর ছেলেরা বিয়ে করে বৌ নিয়ে নিজেদের বাড়িতে থাকে। বেণু আপার কি করার ছিল দুলাভাই যখন সুইজারল্যান্ডে সেটেল হয়ে গেলেন? বরং আপনার ছেলেদের দেশে ফিরে আসা দরকার ছিল। হেলাল আর বেলাল ভাইয়ের তো অভাব ছিল না। দেশে কোনো চাকরি বা ব্যবসায় নেমে পড়লেই হতো। এই বয়সে এসে আপনাকে হতাশার জীবনের গিট বাঁধতে হতো না।
আগে জানলে এই বাড়ি করতাম না। এখন এসব আমার গলার কাঁটা। কতো পরিশ্রমের টাকায় জমি কিনেছি, একটু একটু করে বাড়ি বানিয়েছি। তোর চাচী আমার পেছনে ছিল আঠার মতো– একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন শরিফুল আলম। যখন একতলা হয় বাড়িটা, তখন হেলাল পড়ে নাইনে, আর বেলাল সেভেনে। বেণু মাত্র ফোরে। তোর চাচী বলতো হেলাল বিএ পাস করলেই বিয়ে দিয়ে বাড়িতে সুন্দর একটা বৌ আনবে। নাতী-নাতনীদের মুখ দেখবে। গোটা বাড়ি হাসবে খলখল করে... কোথায় সব? তোর চাচী মরে যাওয়ায় বরং ভালোই হয়েছে রে সজীব, খুব ভালো হয়েছে। আমার এই দীপান্তরের জীবন দেখে যেতে হলো না ওর। বড় স্বার্থপর তোর চাচী।
কি যে বলেন বড় চাচা? চাচী আপনাকে ভয়ানক ভালোবাসতেন। আপনাকে ছাড়া জীবনে কোথাও যান নি বড় চাচী, বলে সজীব।
সত্যি বলেছিস, তোর চাচী আমাকে বড় বেশি ভালোবাসতো। বড় বেশি ভালোবাসতো...। আনমনে থেমে যান শরিফুল আলম। ড্রয়িং রুমে তিনজন মানুষ আছে, বোঝা যায় না। নিরবতা ভাঙ্গেন আপনমনে শরিফুল আলমই, ভদ্রমহিলার উচিৎ হয়নি আমাকে একলা রেখে চলে যাওয়া।
হাসে কামরুল, মামা কি যে বলেন? কেউ কি নিজের ইচ্ছায় চলে যেতে পারে? আমারতো স্পষ্ট মনে আছে, চাচীর ছিল অ্যাজমা। শ্বাসকষ্ট উঠলে চাচী বেহুস হয়ে যেতো। ঘটনাতো সাত আট বছর আগে, দুপুরের পরে। আমি বাসায়। হঠাৎ আপনার ফোন, তাড়াড়াড়ি চলে আয়। মামীর অসুখের ছয় সাত মাস আগে বেলাল ভাই চলে গেছেন কানাডায়। বেলাল ভাইয়ের এক বছর আগে হেলাল ভাই অস্ট্রেলিয়া চলে গেলেন, চাকরি নিয়ে। মামার ফোন পেয়ে বাসায় এসে দেখি, মামী খাটের উপর নির্জীব শুয়ে আছেন। অ্যাম্বুলেন্স চলে এলে মামীকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলাম। ভর্তি করানো হলো কিন্তু– তিন দিন পর মারা গেলেন। তুমি তখন কি ডাক্তার হয়েছো ভাইয়া? দীর্ঘস্মৃতি কামরুল শেষ করে সজীবকে সামনে রেখে।
আমি তখন সিলেটে ওসমানী মেডিকেলের ইন্টার্ন শেষ বর্ষের ছাত্র। মামী আমাকে ছোটবেলা থেকে খুব পছন্দ করতেন। যখন ফোনে খবরটা শুনলাম, তখন কিছু করার ছিল না, ধীরে ধীরে উত্তর দেয় সজীব, কিন্তু খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। এখনও মামীর জন্য খারাপ লাগে..।
জয়নাল? জয়নাল? হঠাৎ চিৎকার করে ডাকেন শরিফুল আলম।
সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে জয়নাল। হাতে নাস্তার ট্রে। দীর্ঘদিনের কাজের মানুষ জয়নাল বোঝে, শরিফুল আলম কখন কি বলবে। নাস্তার ট্রে দেখে শরিফুল বলেন, এতো দেরী কেনো নাস্তা আনতে?
আপনারা কথা বলতেছেন! জয়নাল সবার সামনে ট্রে থেকে পিরিচ নামাতে নামাতে উত্তর দিয়ে তাকায় সজীবের দিকে, ভাইজান, চা দিমু?
চা? দিন। চিনি দিয়েন না, সজীবের কথার পরে জয়নাল তাকায় কামরুলের দিকে। কামরুল জানায়, আমি চা খাবো না।
শরিফুল আলম মুখে আপেল দিয়ে বলেন, আমাকে 'র চা দিস লেবুর রস দিয়ে। লেবু আছে?
ঘাড় কাত করে জয়নাল, আছে।
চা খেয়ে চলে যায় কামরুল আর সজীব। রাত সাড়ে ন'টা। খেতে বসেছেন শরীফুল, ল্যান্ডফোন আসে। জয়নাল রিসিভার নিয়ে এলে কানে নেন, হ্যালো?
ভাইজান? কেমন আছেন? আপনার শরীরটা কেমন? ঝুমার মা ফোন করেছে। ঝুমা আর ঝুমার মায়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। বয়সে ছোট হলেও ঝুমার মা তাহমিনা কিন্তু মানুষ হিসেবে খুবই নীচু মনের। জীবনে, কোনোদিন স্বার্থ ছাড়া কাউকে ফোন দেয়নি। বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে তাহমিনার। ওর স্বামী রায়হান রহমান আবার মানুষ ভালো। সেই মানুষটাকেও নষ্ট করেছে তাহমিনা। ইদানিং ঘন ঘন ফোন দেয়, কারণ একটাই– শরিফুল আলম ভাবেন, আমার মৃত্যু কতো কাছে? অথচ ঝুমা, মেয়েটা একেবারে মায়ের বিপরীত। অসম্ভব মানবিক আর পরোপকারী। ছোট ভাই সজীবের বাবা ফকরুল আলম আজকাল ঘনঘন ফোন দেয়। হঠাৎ হঠাৎ এসে হাজির হয় বাসায়। মুখে লেগে থাকে বিশ্রি হাসি, ভাইজান আপনাকে দেখতে এলাম। কেমন আছেন?
দাঁতের উপর দাঁত রেখে সহ্য করেন তিনি, আছি আর কি!
মনে মনে ইচ্ছে করে শাপলা মাছের লম্বা লেজ দিয়ে পিটিয়ে চামড়া তুলতে। হারামজাদা গ্রামের জায়গা-জমিন সব ভোগ করছে। জীবনে একটা কলা বা আম সামনে দিয়ে বলেনি, এইটা বাড়ির গাছের, আপনার জন্য এনেছি। যখন বুঝেছে ছেলে মেয়েরা আসবে না দেশে, এখন ঘন ঘন গ্রামের বাড়ি থেকে আসে। মোবাইলে খবর নেয়। অসহ্য যন্ত্রনা।
আছি এক প্রকার। আমি খাচ্ছিরে..।
ঠিকাছে, খান। পরে আবার ফোন দেবো।
আচ্ছা।
ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। সকালে কাজ আছে। একটা জায়গা দেখতে যাবেন। শহর থেকে দূরে, গাড়িতে যেতে ঘন্টা দুয়েক লাগবে। জায়গাটা দেখার পর সিদ্ধান্ত নেবেন। কেউ জানে না শরিফুল আলমের পরিকল্পনা। তিনি ভেতরে ভেতরে অস্থির। কাজটা শেষ করতে পারবেন তো? জায়গা দেখে পছন্দ করেছেন তিনি। সাড়ে ছয় বিঘা জমি। প্রধান সড়ক থেকে ছোট একটা রাস্তা নেমে গেছে গ্রামের ভেতরে। বড়দিঘীর রাস্তা বলে এলাকাবাসী। এলাকার উপর দিঘীর আছর আছে। গ্রামের নাম দিঘীরপাড়। ইউনিয়নের নাম দিঘীরকান্দা। বড়দিঘীর রাস্তার ভেতরে গাড়িতে পাঁচ মিনিট গেলেই শরিফুল আলমের পছন্দের জায়গা। বেশ খোলামেলা। যেই মানুষটা জায়গার সন্ধান দিয়েছে, আলতাফ মিয়া। আলতাফ মিয়া এসেছিল ঢাকার খুব

নামীদামী ডেভেলপার কোম্পানী থেকে, তার বাড়িটা ডেভেলপার কোম্পানিকে দেবে কি না, খোঁজ নেয়ার জন্য। কতো কোম্পানি থেকে যে মানুষ আসে, বিরক্ত শরিফুল আলম। কিন্তু কথায় কথায় আলতাফ মিয়াকে ভালো লেগে যায়। বলেন, আপনি এই বাড়ি কেনা-বেচা বাদ দেন। বরং আমার একটা উপকার করেন।

কী উপকার?

ঢাকা শহর থেকে দূরে, ধরুন শহর থেকে ত্রিশ পয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে, নিভৃত গ্রামের দিকে পাঁচ সাত বিঘা জায়গা দেখে দিতে পারেন? আপনাকে যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে।

অবাক আলতাফ, এই বয়সে সেই জায়গায় কি করবেন আপনি?

রহস্যময় হাসি শরিফুল আলমের। আমার একটা গোপন পরিকল্পনা আছে। পরে আপনাকে জানাবো। আগে জায়গা খুঁজে বের করুন।

আলতাফ মিয়া চলে যাওয়ার সাত দিনের মাথায় হাজির। জায়গার বর্ণনা শুনে শরিফুল খুশি- মনে হয় আমার পছন্দই হবে। চলুন দেখে আসি।

দেখার পরই দলিল রেজিস্ট্রি করেছে। চারদিকে বাউন্ডারিও উঠেছে। আলতাফ মিয়া চাকরি ছেড়ে শরিফুল আলমের গোপন পরিকল্পনার সব কাজের দায়িত্ব নিয়েছে। জয়নাল বুঝতে পারে, শরিফুল আলম একটা কিছু ঘটাচ্ছেন কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে না ভয়ে। কিন্তু যে ভয়টা করেছিল, সেই ভয়টাই সত্যি হলো। শরিফুল আলম ডেকে বললেন, জয়নাল? তুই এইবার দেশে চলে যা।

দেশে গিয়ে কি করবো? অবাক জয়নাল।

শোন, আমি এই বাড়ি বিক্রি করে অন্যকোথাও চলে যাবো। আমার সঙ্গে কেউ থাকবে না। আমি একা থাকবো। মানুষ আমার ভালো লাগছে না। তোকে আমি অনেক টাকা দিচ্ছি। তুই তোর গ্রাম উজানগাওয়ে জায়গা রেখে হালচাষ করলে ভালোভাবে থাকতে পারবি।

আপনি যেইখানেই যাবেন, আমি সেইখানেই যামু, জয়নাল কাতর গলায় জানায়।

কঠোর শরিফুল আলম, না। আমি যেখানে যাবো সেখানে পরিচিত কেউ যাবে না। বুঝলি?

ঠিক আছে, বাধ্য হয়ে মেনে নেয় জয়নাল। শরিফুল আলম ভালো টাকা দেন ওকে। এক সকালে শহর ছেড়ে চলে যায় জয়নাল। জয়নালের চলে যাওয়ার আগেই ঢাকা শহরের বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন শরিফুল আলম। টাকাটা জমা করেছেন অন্য ব্যাংকে, নতুন অ্যাকাউন্টে। কিছু টাকা নিয়ে রেখেছেন দিঘীরপাড়ার নতুন জায়গায়, বা বাসায়। পরিকল্পনা মতো এক সকালে, ঘুম থেকে উঠে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন শরিফুল আলম। যাবার আগে মোবাইল ফোনের সেটটা ফেলে দিয়েছেন জলের ড্রেনে। নতুন কোনো মোবাইল নিলেন না তিনি। আজকাল মোবাইলের ট্র্যাক খুঁজে পুলিশের সহায়তায় চাইলেই বের করতে পারবে যে কেউ। সেই পথ আর রাখলেন না। বাড়ির প্রতিবেশীদের কিছু বললেন না। প্রিয় দুজন মানুষ ঝুমা বা সজীবকেও কিছু জানালেন না। স্থির প্রতিজ্ঞা করেছেন, সন্তানেরা, যাদের জীবনের সকল স্নেহ মমতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন, সেই সন্তানেরাই যদি দূরে গিয়ে ভুলে থাকতে পারে, আমিও পারি ওদের বিসর্জন দিতে। স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা কেবল এক দিকের স্রোত নয়। সন্তান না হলে বাঁচতেন না? নিশ্চই বাঁচতেন। হয়তো সেই বেঁচে থাকার লড়াই বা গল্প হতো অন্যরকম। আর জগতের সব ত্যাগ কি পিতা মাতাকেই করতে হবে? সন্তানের কোনো দায় নেই? আসলে দুর্দমনীয় যৌবনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে সব ব্যাটাই সব ভুলে যায়। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে পৌঢ়ত্বের দুয়ারে দাঁড়িয়ে, মাত্র কয়েক বছর পরই। অনেক হিসেব নিকেশ করে শরিফুল আলম গোপন একটা চালচিত্র আঁকেন নিজের মতো করে। তিনি নিশ্চিত, স্ত্রী বেঁচে থাকলে নিজস্ব চিন্তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারতেন না।

পরের দিন কামরুল হক বড় চাচার বাড়িতে এসে অবাক। বাড়ির সামনে বিরাট সাইনবোর্ড, এক বিখ্যাত ডেভেলপার কোম্পানির। গেটে নতুন প্রহরী। ঢুকতে দেয় না কামরুলকে। অবাক কামরুল ফোন দেয় মামাতো ভাই সজীবকে, ভাইয়া?

কী রে?

বড় চাচা তো বাড়ি ডেভেলপারকে দিয়ে কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে শরিফুল আলমের বাড়ির সামনে সজীব, ঝুমা, ছোট ভাই, ছোটবোন হাজির। প্রত্যেকে নিজের মোবাইল থেকে শত শতবার মোবাইল করছে, উত্তর আসে– এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব নয়...। উপস্থিত মানুষগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। থানায় ডায়রি করা হয়েছে। ডেভেলপার কোম্পনিকে জিজ্ঞেস করা হলে, জানায় উনিতো এই বাড়ি আমাদের কাছে এক বছর আগে বিক্রি করেছেন। আর আমরা জানি শরিফুল আলমের দুই পুত্র, এক কন্যা আছে। তারা দেশের বাইরে..। আমরা কাগজপত্র দেখেছি, সলিট জমি পেয়েছি, কিনেছি। প্রয়োজন মনে করলে আপনারা কোর্টে যেতে পারেন।

একদিন, সাতদিন, পনেরো দিন.. একমাস, ছয় মাস.. এক বছর... কোনো খবর পাওয়া যায় না শরিফুল আলমের। আত্মীয় স্বজনেরা ব্যাকুল। খবর পেয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে হেলাল, কানাডা থেকে বেলাল আর সুইজারল্যান্ড থেকে কন্যা বেণু আসে। বিক্ষুব্ধ অভিমানী পিতাকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, বাবা– আমরা তোমার কাছে ফিরে এসেছি। তুমি ফিরে এসো। যেহেতু শরিফুল আলম কোনো পত্রিকাও রাখেন না, তিনি বিজ্ঞাপনও দেখেননি। ছেলেমেয়েরা প্রিয় পিতার জন্য হাহাকার করে।

আমরা জানি, শরিফুল আলম আছেন ঢাকা শহর থেকে ত্রিশ পয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরের দিঘীরপার গ্রামে। গড়ে তুলেছেন গৃহপালিত প্রাণীদের একটি চিড়িয়াখানা। যে চিড়িয়াখানায় আছে, হাঁস মুরগী বিড়াল গরু ছাগল কুকুর খরগোশ মহিষ..। সারাদিন প্রাণীদের সঙ্গে থাকেন। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেন। নিজের সন্তানের মতো পালেন প্রাণীদের। শরিফুল আলম প্রাণীদের মধ্যে যখন এসে উপস্থিত হন, প্রত্যেক প্রাণী নির্ভরতার সঙ্গে তাকায়, আনন্দে ডাকাডাকি করে। তিনি নিশ্চিত, এইসব গৃহপালিত পশুরা কখনো জমিজমার টাকা পয়সার লোভ করবে না...। অবর্ণনীয় সুখে শরিফুল আলম ভেসে বেড়াচ্ছেন নিজের গড়া গৃহপালিত পশু চিড়িয়াখানায়... ■

নজরুল কাব্যে চিত্র ও চিত্রকল্প

মাহবুব সাদিক

রোম্যান্টিক আবেগ ও আর্তি নজরুল-প্রতিভার বিকাশের মূলে পুষ্টি জুগিয়েছে। উদ্দাম রোম্যান্টিক আবেগ, মননশীল হার্দ্য রহস্যচেতনা ও চিত্রসৃষ্টির আতিশয্যময় আবেগ, তীব্রতা তাঁর কবিতাকে গতিশীল করেছে। রোম্যান্টিক প্রতিভা যে তীব্র আবেগে শিল্পের প্রকরণ-শৃঙ্খলা ভেঙে উদ্দাম শব্দস্রোতে ভাসে– নজরুলের ক্ষেত্রে তারও অন্যথা হয়নি। তিরিশোত্তর কবিতা প্রকরণের দিক থেকে যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও নজরুল কাব্যকলার সেই প্রাকরণিক সমৃদ্ধির প্রতি তেমন দৃকপাত করেননি। ফর্মের প্রতি এই অমনোযোগ কিন্তু প্রমাণ করে না যে, আধুনিক কাব্যকলার প্রকরণ বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যে একেবারে অনুপস্থিত। বরং আমরা লক্ষ্য করলে অবাক হই এই ভেবে যে, অমনোযোগ সত্ত্বেও তাঁর কবিতা প্রায় তাঁর অলক্ষ্যেই আধুনিক কাব্য প্রকরণকে অঙ্গীকার করেছে। নজরুল ইসলামের কবিতায় চিত্রের প্রাচুর্য যেকোনো সচেতন পাঠকের চেতনাগোচর হবে এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক অবিলম্বে আবিষ্কার করবেন যে, তাঁর কবিতায় সংহত চিত্রকল্পের সংখ্যা কম হলেও উপর্যুপরি চিত্র ও কল্পনার আবেগে নির্মিত হচ্ছে চিত্রকল্পের সৌন্দর্যদ্যুতি।

আধুনিক কাব্যকলায় চিত্রকল্পের ব্যবহার সুপ্রচুর। রবীন্দ্রকাব্যে চিত্রকল্পের বিবিধ ও বিচিত্র ব্যবহার হয়েছে। ত্রিশোত্তর কবিরা, প্রকরণের প্রতি তীব্র সচেতন, চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন আত্যন্তিক সচেতনতায়। কাজী নজরুল ইসলাম সচেতনভাবে চিত্রকল্পের প্রাকরণিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন কি না বলা মুশকিল– কিন্তু তার রচনায় চিত্রকল্প একেবারে কম নয়। চিত্রের সঙ্গে চিত্রকল্পের যোগ যদিও ঘনিষ্ঠ, কিন্তু শুধু চিত্র চিত্রকল্প নয়। কবির মানস স্মৃতি-অভিজ্ঞান-অভিজ্ঞতা-বুদ্ধি-মনন-আবেগের সহযোগে সংহত হয়ে চিত্রকল্পের জন্ম দেয়। নজরুলের রোম্যান্টিক কবি-প্রতিভাও একই প্রক্রিয়ায় চিত্রকল্পের জন্ম সম্ভব করে তুলেছে। তাঁর কবিতায় চিত্র ও চিত্রকল্পের দ্যুতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আগে আধুনিক এই প্রকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি প্রাথমিক

ধারণা নেয়া প্রয়োজন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই ইউরোপীয় কবিতায় চিত্রকল্পবাদী কাব্যান্দোলনের জন্ম হয় (১৯১২-১৯১৭)। অংশত টি. ই. হিউমের কাব্যিক মতাদর্শ এবং অতি ভাবপ্রবণতাবাদী কাব্যাদর্শের প্রতি এজরা পাউন্ডের বিরোধিতা থেকেই চিত্রকল্পবাদী কাব্যান্দোলনের প্রসার ঘটে। উইন্ডহ্যাম লুইস, এমি লাউয়েল এবং হ্যারিয়েট মনেরা ত্রিকল্পবাদী কাব্যান্দোলনের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়েছিলেন। এজরা পাউন্ডের নেতৃত্বে পরিচালিত এ কাব্যান্দোলনের উত্তরাধিকারীরা হচ্ছেন হিলডা ডোলিটল, ডি. এইচ. লরেন্স, উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস, জন গোল্ড ফ্লেচার এবং রিচার্ড এলডিংটন।

আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্পবাদী কাব্যান্দোলনের প্রসার ঘটেনি, কিন্তু আধুনিক বাঙালি কবিরা চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন। বাংলা চিত্রকল্প শব্দটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উদ্ভাবন বলে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সমালোচনার পরিভাষা'য় [দ্র. কবিতা, ১৪/১, ১৩৫৫ আশ্বিন] উল্লেখ করেছেন। এ তথ্যের প্রতিবাদ করেছেন আবু সায়ীদ আইয়ুব। 'পথের শেষ কোথায়' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে, 'ইমেজারি'র প্রতিশব্দ হিসেবে চিত্রকল্প শব্দটি তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছেন।

কবির সৃষ্টিশীল সামগ্রিক মানস এবং সৃজনক্রিয়ার আবেগ চিত্রকল্পের জন্ম দেয়। এজরা পাউন্ড লিখেছেন, সৃষ্টিকর্মে তাৎক্ষণিক মুহূর্তে আবেগ ও বুদ্ধির যৌগ উপস্থিত করে চিত্রকল্প। সিসিল ডে লুইস চিত্রকল্পকে কবিতার জাদুদর্পণ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, চিত্রকল্প কেবল থিমকেই প্রতিফলিত করে না– তাকে দেয় সপ্রাণ গতিশীলতা এবং যথাযথ আঙ্গিক। শব্দের মধ্যে আমরা এক একটি চিত্রের ধারণা লাভ করি। শব্দনির্মিত চিত্র ইমেজের একটি লক্ষ্য হলেও, শুধু চিত্র চিত্রকল্প নয়। চিত্রশিল্প যেমন শুধু চোখকেই তৃপ্ত করে না, উদ্বুদ্ধ করে মানস কল্পনা–জন্ম দেয় তৃতীয় মাত্রার; চিত্রকল্পও তেমনি তৃতীয় মাত্রার জন্মদাতা। পাঠকের কল্পনাই একে সম্পূর্ণ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয়, তবে সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।'

ইউরোপীয় ইমেজিস্ট কাব্যান্দোলনের প্রভাবেই আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প রচিত হলেও নজরুল ইসলামের কবিতায় ইমেজিস্ট কাব্যকলার প্রভাবে চিত্রকল্প রচিত হয়নি। বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের মধ্যেই চিত্র ও সংগীতের যে বাঙ্ময় প্রকাশ বর্তমান, নজরুলের কবিতায় তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রকাব্যে চিত্র ও সংগীতগুণের যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে আধুনিক বাংলা কবিতাকে তা বহুদূর প্রভাবিত করেছে। নজরুলের কবিতায় আছে এই চিত্র ও সংগীতের যুগল মিথষ্ক্রিয়া। তার কাব্য-পঙ্‌ক্তি প্রায়শ ধরে চিত্রের বর্ণাঢ্য ঔজ্জ্বল্য। দু-একটি উদাহরণ নেয়া যাক :

ক. আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল;
কোন গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিয়ে প্রিয়ায়,
উল্কার মানিক ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যায়।
[স্তব্ধ রাতে, চক্রবাক]

খ. সাতাশ তারার ফুল- তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে।
... .
আবেগে সোহাগে আকাশ–প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কি
শিশিরে রূপে ঘর্মবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে সখি,
[চাঁদনি রাতে, সিন্ধু-হিন্দোল]

বিমূর্ত চিত্ররূপ যখন কল্পনার গভীর স্পর্শে নতুন বিমূর্ত চিত্রের শোভারূপ রচনা করে অসীমের দিকে খুলে যায়, চিত্রকল্প তখনই ব্যঞ্জনা লাভ করে। নজরুলের কবিতায় উপর্যুক্ত দুটি অংশের মধ্যে শুধু যে ছবির অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে তাই নয়, রোম্যান্টিক অসীমে এখানে বিমূর্ত রূপসীর রূপ লাবণ্যের ছায়াস্পর্শ পাঠকের কল্পনাকেও উদ্বুদ্ধ করছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির দরোজা খুলে দিচ্ছে পঙক্তিগুলো, জেগে উঠছে ছবির পর ছবি। নজরুলের স্নিগ্ধ ও ইন্দ্রিয়-সংবেদী আবেগ-সঞ্চারী পঙক্তিমালা এখানে কয়েকটি রূপক শব্দকে ভর করে আছে। প্রথমটিতে শিশির ও ফুলের অনুষঙ্গে নির্মিত হয়েছে রূপসীর অবয়ব। 'রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল'– এই পঙক্তির মধ্যে দূর-বিস্তারী কল্পনা অসীমের দিকে ডানা মেলে দেয়। পরবর্তী দুটি পঙক্তিতে ও উল্কার ঔজ্জ্বল্যে কবি কল্পনা পাখা বিস্তার করছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে সমাসোক্তি ও রূপক যুগলভাবে কাব্যপঙ্‌ক্তিতে শিখা-সঞ্চারী আলো জ্বেলেছে। এখানে ইন্দ্রিয়ের সান্দ্র রূপবিভা জ্বেলেছেন নজরুল, সমাসোক্তি অলংকারে ভর করে আকাশ বাতাস তারার ফুল তোড়া হাতে গোপনে তারা-পালঙ্কে প্রতীক্ষারত প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শেষ পঙক্তিদ্বয়ে পূর্বের ভাবনারই সম্প্রসারণ ঘটেছে। উপর্যুক্ত দুটি উদাহরণই আছে চিত্রকল্পের আবশ্যক উপাদান এবং তা হার্দ্য-মনন সহযোগে চিত্রের পর চিত্রের জন্ম দিচ্ছে। তবু এগুলোকে পরিপূর্ণ চিত্রকল্প বলা যাবে না। যে গাঢ়বন্ধ সংহতি চিত্রকল্পকে প্রগাঢ়তা দেয় এ দুই উদাহরণে তা নেই। অভিনবত্ব ও অপূর্বত্বও চিত্রকল্পের মধ্যে আমরা পেতে চাই। কল্পনার সেই অপূর্ব দ্যুতি যখন গাঢ় সংহতিকে স্পর্শ করবে, চিত্রকল্পকে তখনই সম্পূর্ণ বলা যাবে। নজরুল ইসলামের কবিতায় চিত্রকল্পের এই অপূর্ব প্রগাঢ় সংহতি কম হলেও পাওয়া যাবে। কয়েকটি উদাহরণ :

ক. ঐ সে মহাকালসারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড় তুফানে!
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছোটায় নীল খিলানে।
[প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা]

খ. বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাখায় দিকবধূদের কেশে
ডাকতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নামে–
[পথহারা, দোলনচাঁপা]

গ. হেমন্ত গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত।
কিরণ-ধারায় ঝরিয়া পড়িতে সূর্য-আলো সরিৎ।
দিগন্তে যেন তুর্কী কুমারী
কুয়াশা নেকাব রেখেছে উতারি,
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ।

ঘ. ধরণী দিয়াছে তার
গাঢ় বেদনার
রাঙা মাটি-রাঙা ম্লান ধূসর আঁচলখানি
দিগন্তের কোলে কোলে টানি।
[বেলাশেষে, দোলনচাঁপা]

ঙ. আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে
উঠবে যখন গরব ভরে
তুমি বাকী আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে।

চ. শীতল নীরে নেয়ে ভোরে ফুলের সাজি হাতে;
রাঙা উষার রাঙা সতীন দাঁড়াও আঙিনাতে।

উপর্যুক্ত উদাহরণমালার প্রতিটিই দৃষ্টিনির্ভর চিত্রের সমাহার; উদাহরণগুলো চিত্ররচনার দিক থেকে প্রকৃতিকেই অঙ্গীকার করেছে। প্রকৃতির পটে প্রতিস্থাপিত জীবনই কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পের আধার।

এবং এও আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে যে, উপর্যুক্ত চিত্রকল্প প্রতিটিই কোমল ও নম্র প্রাকৃতিক উপকরণ অঙ্গে ধরেছে। প্রথমটিই কেবল এর ব্যতিক্রম; উদ্ধৃতি (ক) এ মহাকালের চিত্রকল্প দৃপ্তরূপে নির্মিত। মহাকাল গতিশীল দুর্দম ঘোড়সওয়ারের বেশেই এখানে উপস্থিত এবং কবি এই নির্মম সারথির রূপকল্প নির্মাণে যথোপযুক্ত আবহ ব্যবহার করেছেন। প্রাকৃতিক ঝড়-তুফান ও বজ্রের গর্জন সেই দৃপ্ত গতিশীল মহাকালের রক্ত-তড়িতের চাবুক-খাওয়া বাহনের আর্তনাদ। দ্রুত ধাবমান কোনো বলশালী তুর্কী ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতেই যেন উল্কার উজ্জ্বল পতন ঘটে। চিত্রকল্পটিতে মহাকালের দুর্দম গতিশীল দীপ্রতাই সঞ্চারিত হয়েছে। পরবর্তী উদাহরণমালা অবশ্য কোমল ও নম্র নিসর্গকেই ধারণ করেছে। উদ্বৃতি (গ) এর প্রথম পঙক্তিতেই ব্যবহৃত হয়েছে একটি চমৎকার সমাসোক্তি অলংকার। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু এবং জীবনানন্দ দাশের দুটি সমাসোক্তি বাহিত চিত্রকল্প সচেতন পাঠকের স্মরণে আসবে। বুদ্ধদেব বসু; 'রূপোলি জল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ/নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর/সূর্যের চুম্বনে'। জীবনানন্দ দাশ; 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপর মাথা পেতে/অলস ধোঁয়ার মতো এইখানে কার্তিকের খেতে।' নজরুল ইসলামের মতোই তাঁর উত্তরপুরুষ কবিদ্বয় বিমূর্ত বস্তুতে চেতনের ক্রিয়া আরোপ করেছেন নজরুলের ধরনেই। নজরুলের স্মৃতিতে বিমূর্ত ঋতুই চেতন মানুষের ক্রিয়াকর্মে নিজেকে জড়িয়ে সম্পূর্ণ চিত্রকল্পটির জন্ম সম্ভব করে তুলেছে। পূর্ববর্তী চিত্রের অনুষঙ্গেই নির্মিত হয়েছে আমাদের ঈষৎ দূরবর্তী, অদৃষ্টপূর্ব বলেই সুন্দরতমা, তুর্কী-কুমারীর কুয়াশার ঘোমটা খোলা সৌন্দর্যবিভা। শেষ পঙক্তিটিও একটি চমৎকার সমাসোক্তি, নিশীথের মধ্যে আরোপিত হয়েছে মানবীয় ক্রিয়া এবং একই পঙক্তিতে চাঁদের প্রদীপতলে নিশীথের নিশি-জাগা রূপচিত্র পাঠককে চমৎকৃত করে।

পরবর্তী উদ্ধৃতিও (ঘ) সমাসোক্তি অলংকারের উপর ভর করে চিত্রকল্পে সমর্পিত হয়েছে। সন্ধ্যাবেলার নিবিড় গাঢ় মাটি-রাঙা ম্লান গৈরিক আলো এখানে দিগন্তব্যাপী বেদনার উদ্ভাস জাগিয়ে তুলেছে। উদ্বৃতিতে ফুল-সাজি হাতে ভোরের কুয়াশা মাখা গায়ে যখন মেয়েটি আঙিনায় দাঁড়ায় তখন 'সতীন' শব্দের প্রয়োগে ঊষা এবং মেয়েটির রাঙা রূপের মধ্যে যে সগর্ব অসূয়াকাতর দৃষ্টিবিদ্বেষ ফোটে তা যেন পাঠকের চোখে পড়ে। রোম্যান্টিক কবি-কবিতা তাঁর মানস-গভীরে প্রকৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। এই আকর্ষণ নজরুলের মধ্যে ছিল। উপর্যুক্ত উদাহরণমালার প্রতিটির মধ্যে আছে প্রকৃতির রূপশোভা; প্রকৃতির নম্র ও মোহনরূপই এর লক্ষ। মহাকালের চিত্রকল্পটিই কেবল দৃপ্ত ঘোড়সওয়ারের অশ্বক্ষুরধ্বনির অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলে এবং উল্কার মতো ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়। অবশ্য তাও প্রকৃতিজাত।

নজরুলের চিত্রকল্পের দৃশ্যপ্রধান অংশগুলো বিশদ হয়েই চোখে পড়ে। আমাদের দৃশ্যচেতনা তৃপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিচেতনাও অতৃপ্ত থাকে না। দৃশ্যকল্প ও শ্রুতিপ্রধান চিত্রকল্পের দুটি উদাহরণ চয়ন করা যায় নজরুলের গদ্য থেকে।

ক. কি স্নিগ্ধ নিঝুম নিশি ভোর! সরা প্রকৃতি এখনও তন্দ্রালস নয়নে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে রয়েছে। গোলাবী রং এর মসলিনের মত খুব পাতলা একটা আবছায়া তার ঘুম-ভরা ক্লান্ত দেহটায় জড়িয়ে রয়েছে।
[রিক্তের বেদন, রিক্তের বেদন]

খ. শুধু কোথায় সান্ধ্য নীড়ে বসে একটি 'ধুলো-ফুরফুরি' শিশ দিয়ে বাউল গান গাইছে, আর তারই সূক্ষ্ম রেশ রেশমি সুতোর মতো উড়ে এসে আমার আনমনা মনে ছোঁয়া দিচ্ছে। [অতৃপ্ত কামনা, ব্যথার দান]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এইসব টুকরো দৃশ্যকল্পগুলো চিত্রের মধ্যে দিয়েই আমাদের চেতনালোকে প্রবেশ করে। প্রথমটির শরীরী অবয়ব প্রধান হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়টি শ্রুতিমাধ্যমে জাগিয়ে তুলছে চিত্রলতা। জড়প্রকৃতি ও বিমূর্তের উপর প্রাণজ সত্তার ক্রিয়া-আরোপ নজরুলের চিত্রকল্পে সজীবতা সঞ্চার করেছে। এর আরো একটি উদাহরণ গদ্যরচনা থেকে দেয়া যায়।

আঁধারের চাদর মুড়ি দিয়ে তখনো রাত্রি অভিসারে বেরোয়নি। তখনো বুঝি তার সান্ধ্য প্রসাধন শেষ হয়নি। শঙ্কায় হাতের আলতার শিশি সঝাঁঝের আকাশে গড়িয়ে পড়েছে। পায়ের চেয়ে আকাশটাই রেঙে উঠেছে বেশি। মেঘের কালো কোঁপায় তৃতীয়া চাঁদের গোড়ে মালাটা জড়াতে গিয়ে বেঁকে গেছে। উঠোনময় তারার ফুল ছড়ানো।

নজরুলের কবিতা এবং গদ্যে নিসর্গই প্রধান জায়গা জুড়ে আছে, অবশ্যই চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে সন্ধ্যার আকাশ, নিসর্গ ও রাত্রিকে কল্পনা করা হয়েছে অভিসারিকার ছদ্মপ্রতিমায়। সমস্ত নিসর্গব্যাপী এই সুন্দরী অভিসারিকার রূপ-লাবণ্যের ঢল নেমেছে। বর্ণনাটি চিত্রল, চিত্রবহুল। এগুলোকে সংহত চিত্রকল্প বলা যায় না। কিন্তু এই সচল চিত্রলতাই আবেগ ও গতিশীলতার চাপে সংহত হয়ে আসে পাঠকের মনোভূমে। ফলে কল্পনা-প্রতিভার স্পর্শে চিত্রকল্পের দ্যুতি অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় আকাশ ও পৃথিবীর পারস্পরিক মিলন শরীরী হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পে:

হাসিয়া উঠিল আলোকে আকাশ, নত হয়ে এলো পুলকে
লতা-পাতা-ফুলে বাঁধিয়া আকাশে ধরা জয়, 'সই, ভূলোকে
বাঁধা প'লে আজ, চেপে ধরে বুকে লজ্জায় ওঠে কাঁপিয়া,
চুমিল আকাশ নত হয়ে মুখে ধরণীরে বুকে ঝাঁপিয়া।
[রাখীবন্ধন, সিন্ধু-হিল্লোল]

● লেখক : কবি ও শিক্ষাবিদ

নজরুল সাহিত্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা

আল রুহী

সাহিত্য শিল্প নিছক বিনোদন, অলীক কল্পনা অথবা শুধু 'নন্দন' তত্ত্বের বিষয় নয়। তবে সাহিত্য শিল্পের একটি প্রধান কাজই হল মানব মনে বিনোদন তথা আনন্দ দান করা। অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সাহিত্য শিল্প বৃহত্তর সমাজ ভাবনা তথা রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তন, মানবভাগ্যের উত্থান এবং সকল নিপীড়ন প্রতিরোধের এক শক্তিশালী মাধ্যমও বটে। একটি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদির নীরব পর্যবেক্ষণ ও তার চিত্র রূপায়ণে সাহিত্য শিল্পীদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সাহিত্য শিল্প হচ্ছে বৃহত্তর সমাজ চেতনা ও চিরন্তন মানব ভাগ্যের উত্থানের বাণীময় রূপ। যা যুগে যুগে সমাজ সভ্যতাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। আর সভ্যতা ও যুগের দাবিকে প্রতিফলিত ও ধারণ করেই সাহিত্য শিল্পীরা এক মহাদায়িত্ব পালন করেন।

সাহিত্যের এই সামাজিক ভূমিকা জাতীয় চেতনা, দেশাত্ববোধ, মানবপ্রেম, উদার নৈতিক মানবিকতা, মুক্তচিন্তা, নগরায়ণ ও আঙ্গিকের রূপান্তর আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যে এই আধুনিকতার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ফলে। যদিও ইতোপূর্বেই ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য ধারার পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল আধুনিক সাহিত্যের উদগাতা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৪)-এর হাতে। সাহিত্যে এই সমাজ চেতনার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই তাকাতে হবে বহির্বিশ্বের দিকে। রুশ ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কির (১৮৬৮-১৯৩৬) ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। পতন ঘটে রাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার। তেমনি সামন্ততান্ত্রিক ফরাসী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মহাবাণী উচ্চারণ করলেন ফরাসী লেখক ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) ও রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। ভলতেয়ার ও রুশোর অগ্নিঝরা লেখনীতে ফরাসী জাতি সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সামন্তবাদী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তারা হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়েছিল। তাই এর লেখদ্বয়কে বলা হত 'The magician of art of writing'- তাদের লেখনী যাদুকরের মন্ত্রের মত

কাজ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে অত্যাচারী রাজতন্ত্রের সকল অত্যাচার সহ্য করার মত মানসিক শক্তি ফরাসীবাসী পেয়েছিল। ঠিক তেমনি বৃটিশ ভারতে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তবে সমকালের দিক থেকে কবি নজরুল রুশ কবি বরিস পাস্তারনাকের (১৮৯০-১৯৬০) সমসাময়িক। কিন্তু কবি পাস্তারনাকের চেয়েও কবি নজরুলের বক্তব্য ও বাণী স্পষ্ট ও জোরালো। যা তাকে এক বলিষ্ঠ সমাজ রূপকারের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে। তিনি হয়েছেন সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্নদ্রষ্টা।

নজরুল জীবন ও জগৎকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে নিবিড়ভাবে। সাহিত্য শিল্প সৃষ্টিতে তাই তিনি মাটি ও মানুষকে তার হাসি-কান্না, দুঃখ-দারিদ্র্য, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহকে গভীর মমতায় ও সহানুভূতির সাথে উপজীব্য করেছেন। বাণীরূপ দিয়েছেন তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে। তাই বৃহত্তর সমাজ ভাবনা ও মানবচেতনা তার সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে গভীর বিশ্বাস ও নিষ্ঠায়। সমাজ নির্মাণে তিনি এক সুখী ও শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন- যা তার সাহিত্য কর্মের শব্দে শব্দে বাঙময় হয়ে উঠেছে।

নজরুল মূলতঃ রোমান্টিক স্বাপ্নিক কবি। স্বপ্ন ভঙ্গজনিত সুতীব্র বেদনাবোধ তাকে আহত করেছে। করেছে বিক্ষুব্ধ। যে সুন্দর প্রকৃতির প্রেমে তিনি আকুল ছিলেন, চোখ মেলে দেখলেন, তা মায়া-মরীচিকা মাত্র। সমাজ বাস্তবতার প্রখর কঠিন সূর্যালোক তাকে পোড়াতে থাকে ভেতরে বাইরে সমানতালে। তাই কবি তার সৌন্দর্যধ্যান ভঙ্গের কারণ দর্শাতে গিয়ে স্বয়ং বলেন- "আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাকে ক্ষুধাজীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখারও স্তবস্তুতি।"

সাহিত্য সৃষ্টিতে জীবন বিমুখতা কখনও তার আদর্শ হয়ে ওঠেনি। বৃহত্তর মানব কল্যাণ ভাবনা তাঁকে নিয়ত তাড়িত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। সমাজ ব্যবস্থার শিকার অসহায় মানবগোষ্ঠী তাদের মুমূর্ষু জীবনে স্থান পেয়েছে। এই অসহায় মানব গোষ্ঠীর কথা বলতে গিয়ে তিনি তার সাহিত্য কর্মের শিল্প ত্রুটিকে অনেকটা স্বীকার করেছেন। যেখানে নিপীড়িত মানবতার উত্থান, তাদের কল্যাণ চিন্তা মুখ্য, সেখানে শিল্প সার্থকতা বা শিল্পমান তার কাছে গৌণ হয়েছে। সাহিত্যের শিল্প সার্থকতার প্রশ্নে তার মন্তব্য হল- "নজরুলের আগমন বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ সমাজ প্রেক্ষাপটে। অন্যদিকে মুক্তিপাগল মেহনতী ভারতবাসী, কাজেই তাদের মুক্তি মানস ভাবনা তার লেখনীতে যাদুরকাঠির ছোঁয়ার মতই ভাষারূপ পেয়েছে। তিনি যেন তাদের অব্যক্ত মানস ভাবনার এক রূপকার। আর তাদের আশা ও ভাষাতে তিনি বাণী রূপ দিয়ে খুব সহজেই তার সাহিত্য কর্মের বিষয়ভূক্ত করতে লাগলেন। যে ভাষা এক অপ্রতিরোধ্য বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে থাকে। তিনি সকল বাঁধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে স্বদেশী বীরজনতাকে সে অন্যায় শাসন রোধ করার জন্য ডাকলেন–

"বিশ্বগ্রাসীর ত্রাস নাশি আজ আসবে কে বীর এসো,
ঝুট শাসনের করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও।" (সেবক)

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধকল্পে স্বদেশী আন্দোলন চলতে থাকে। পাশাপাশি কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনও চলতে থাকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। স্বাধীনতার নেশায় উন্মত্ত এদেশবাসী। শত শত বিপ্লবী স্বেচ্ছায় কারাবরণ করছে, জেল-জুলুমকে বরণ করছে। বৃটিশ রাজশক্তি বাড়িয়ে দিয়ে দেশের সোনার ছেলেদের ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে হত্যা করতে থাকে। এসব দেখে নজরুল প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হন। তিনি নিজেও কারা নির্যাতন ভোগ করেন। আর সেখানে বসেই তিনি বিপ্লবের মহামন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন–

কারার ঐ লোহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পুজোর পাষাণ বেদী। (ভাঙ্গার গান)

নজরুলের এমনি আত্মজাগরণী গান ও কবিতায় মানুষ একের পর এক উজ্জীবিত হতে থাকে। তারা কোন শাসনের ভয়ভীতিকে আর পরোয়া করে না। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটাই। আর তাহলো জাতীয় চেতনায় অভিসিক্ত হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি চিন্তা, মেহনতী মানুষের কল্যাণ চিন্তা। তারা বিশ্বাস করেন সকল কিছুর প্রতিবাদ আছে; সুতরাং স্বাধীনতার বিনিময় হচ্ছে আত্মদান। কেবলমাত্র আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা আসবে। তাই কবি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও রক্তদানকে স্বাধীনতা লাভের একটি কৌশল বলে উল্লেখ করেছেন। তা হল –

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল পরা-ছল–
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল। (শিকল পরার গান)

এদেশের তরুণ সমাজের ও যুব সমাজের নারীর গভীর টান তিনি অনুভব করেছিলেন মনে প্রাণে। তাই তিনি তরুণ ও যুব সমাজের প্রাণে তারুণ্যদীপ্ত কবিতা ও গানের মালা দিয়ে ভরে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্য। হয়ে গেলেন তাদের প্রিয় কবি, আদর্শ পুরুষ। তিনি এইসব অসহায় মূক মানুষের মুখে তুলেছিলেন বিদ্রোহের বাণী, বিপ্লবের মন্ত্র। আর তা ছড়িয়ে গেল গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে প্রত্যন্ত জনপদে। মানুষের কানে তা বাজতে থাকে মহাপুরুষের পবিত্র বাণীর মত। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত জাগতে থাকল। মাতৃভূমি মুক্ত করতে যে সকল বিদ্রোহী বিপ্লবীরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে থাকলেন- তিনি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতে থাকলেন–

"কাঁদিব না মোরা, যাও কারা মাঝে যাও তবে বীর-সংঘ হে
ঐ শৃঙ্খল করিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে।
মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যারা দিয়াছে প্রাণ
হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরই বিজয় গান।" (বন্দনা গান)

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আমরা নজরুলকে যেভাবে পেয়েছি, রবীন্দ্রনাথকে সেরূপে পাইনি। এ নিয়ে রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটেছিল।

শনিবারের চিঠির সম্পাদক নজরুলের সমালোচক শ্রী সজনী কান্ত দাসের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন- "স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি যেভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে বাঙালির দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর বিপ্লবে যে কারণেই হোক ঠিক সেভাবে সাড়া দেননি। একমাত্র কবি নজরুলই ছন্দে গানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের মত বড় বড় দেশকে জাগাবার জন্যে যে আবেগময় উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্যার প্রয়োজন ছিল; কবি নজরুলের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটেছিল।"

আর এভাবেই নজরুল তার কাব্য ও সাহিত্য সাধনাকে বৃহত্তর সমাজ চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন যা বাংলা সাহিত্যের আসরে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। এক বৈপ্লবিক স্রোতধারায় এভাবে সাহিত্য তার কাছে হয়েছে মানব জাগরণের এক হাতিয়ার। আর এভাবেই তিনি বাঙালি জাতিকে বিপ্লবের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। তার কবিতা গানে মানুষের বিক্ষুব্ধ জীবন যাতনা ফুটে উঠেছে। মানুষের মুক্তির আকুতি ঝরে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের কাহিনীর এক বেদনাময় সচিত্র আলেখ্য জীবন্ত ছবি হয়ে ভেসে উঠেছে, যে বাণীতে মেহনতী মানুষ তার জীবনের কান্না শুনেছে। দেখেছে আত্মমুক্তির ও সমাজ মুক্তির পথ নির্দেশ– মানুষ খুঁজে পেয়েছে তাদের জীবনের ঠিকানা। বিশেষত যে সকল ভাগ্যাহত বঞ্চিত নিরস্ত্র মানুষ নিপীড়িত হয়েছে, অধিকার লুণ্ঠিত হয়েছে তখন নজরুলের ক্ষুরধার বাণী প্রতিবাদ করেছে। ভাষণ হয়েছে শাণিত, দৃঢ় ও ইস্পাত কঠিন। যাকে রুখবার শক্তিও শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। যদিও শাসকগোষ্ঠী চেষ্টার কসুর করেনি। এ ক্ষেত্রে ফরাসী লেখক রুশোর সঙ্গে নজরুলের খানিকটা মিল দেখতে পাওয়া যায়।■

● লেখক : প্রাবন্ধিক, গবেষক ও আইনজীবী।

সমতলের চা চাষী মানিক চন্দ্র

বিদ্যুত খোশনবীশ

এক দশক আগেও বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের উপজেলা তেঁতুলিয়ার ছিলো নানা অপবাদ। খুব সাদামাটা কৃষি অর্থনীতি আর পরিবেশ বিধ্বংসী পাথর উত্তোলনই ছিলো এর মূল কারণ। আখ চাষের একটা ঐতিহ্য ছিলো কিন্তু মাটি খুঁড়ে পাথর উত্তোলন বেশি লাভজনক হওয়ায় একটা দীর্ঘ সময় ধরে এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস ছিলো এটি। তবে প্রশাসনের উদ্যোগে পাথর উত্তোলন নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয়রা ঝুঁকে পড়েন চা উৎপাদনে। আর এখন চায়ের আবাদ তেঁতুলিয়ার সব অপবাদকে চিরতরে মুছে দিয়েছে। আখ, ধান ও পাথরের পরিবর্তে পঞ্চগড়ের এ উপজেলার বিস্তীর্ণ কৃষি জমি এখন ছেয়ে গেছে দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির সবুজ চাদরে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ বাড়ির আঙ্গিনায় যেভাবে সবজি চাষ করেন, তেঁতুলিয়ার মানুষ সেরকম জায়গায় চাষ করেন চা। শুধু পঞ্চগড়ই নয়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারি ও দিনাজপুরের মাটিও এখন চা গাছের উর্বর জননী। এ এক নয়া বিপ্লব। উত্তর এখন দেশের তৃতীয় বৃহত্তম চা অঞ্চল।

শিরোনামে যার কথা বলেছি তার বাড়ি তেঁতুলিয়ার চৌধুরী গছ গ্রামে। মানিক চন্দ্র রায় স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষিত যুবক। মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে ভেবেছিলেন চাকরি করবেন। কিন্তু চাকরির বাজার তাকে হতাশ করেছিলো। এটা ২০১০ সালের কথা। ১৯৯৯ সালে সরকারি উদ্যোগে পঞ্চগড়ে শুরু হওয়া চা চাষ প্রকল্প ততোদিনে কৃষক পর্যায়ে বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। মানিক চন্দ্রের এক নিকট আত্মীয়ও চা চাষ করতেন। তার সাফল্য দেখেই নতুন এক পথের সন্ধান পেয়ে যান তিনি। স্কুল শিক্ষক বাবার কৃষি জমির অভাব ছিলো না, সেই জমিতেই একটু একটু করে চায়ের বাগান গড়ে তুলতে থাকেন। বর্তমানে মানিক চন্দ্রের চায়ের বাগানের ব্যাপ্তী ১০ একর জায়গা জুড়ে। সরকারের সংজ্ঞা অনুযায়ী পঞ্চগড়ে তিন ধরনের চা চাষী আছে। ৫ একর জমি পর্যন্ত স্মল গ্রোয়ার, ১০ একর পর্যন্ত স্মল হোল্ডার আর ২০ একরের উর্ধ্বে হলে টি এস্টেট। মানিক চন্দ্র পঞ্চগড়ের ১৫ জন স্মল হোল্ডারের একজন।

বর্তমানে পঞ্চগড়ে টি এস্টেটের সংখ্যা ১৯টি হলেও সরকারিভাবে নিবন্ধিত হয়েছে ৯টি। এই টি এস্টেটগুলো নিজস্ব বাগানে চা উৎপাদন করে প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। এক্ষেত্রে কাজী টি এস্টেটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ পঞ্চগড়ের সমতলে এই প্রতিষ্ঠানটিই প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চা

চাষের সূচনা করে এবং অর্গানিক চা উৎপাদন করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের বড় একটি অংশ দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই ১৯টি চা এস্টেট এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি চা চাষীদের কল্যাণে পঞ্চগড়ের প্রায় ২৫ হাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চা শ্রমিকদের জীবন যাত্রায় এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। প্রতিটি ঘরেই রচিত হয়েছে দিন বদলের গল্প। তবে এই গল্পগুলো এখনও আমাদের অজানা।

চা চাষের নিয়মটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রোপনের পর দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে প্রতিটি গাছ পাতা সংগ্রহের উপযোগী হয়ে উঠে। বছরে কমপক্ষে ৬ বার করে টানা ৮০-১০০ বছর পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা যায় চা গাছ থেকে। এক একটি চা গাছের চারার দাম ৩-৮ টাকা আর পাতা বিক্রি হয় বাজার চাহিদা ভেদে ১৮-৩৮ টাকা কেজি দরে। দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির মূল্য যদি ২৫ টাকা থাকে তাহলে মানিক চন্দ্রের মতো চাষীদের বছরে আয় হয় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা।

চা বাগানের যত্ন নেয়ার জন্য মানিক চন্দ্রের ২ জন স্থায়ী শ্রমিক আছে আর পাতা সংগ্রহের মৌসুম এলে এক সঙ্গে কাজ করে ১৫ জন অস্থায়ী শ্রমিক। প্রতি কেজি পাতা সংগ্রহের জন্য এই শ্রমিকদের দিতে হয় ৩ টাকা করে। পাতা বিক্রির জন্য প্রসেসিং ফ্যাক্টরি নির্বাচনে উদ্যোক্তাদের উপর কোন চাপ বা বাধ্যবাধকতা নেই। পছন্দ অনুযায়ী যে কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে চা বিক্রি করতে পারেন তারা। মানিক চন্দ্রের পছন্দ নর্থ বেঙ্গল টি ইন্ডাস্ট্রিজ। খবর দিলেই ফ্যাক্টরি থেকে গাড়ি এসে চায়ের পাতা নিয়ে যায়, আর নিজ খরচে ফ্যাক্টরিতে পাঠালে প্রতি কেজিতে ৫০ পয়সা করে বেশি আয় হয়।

মানিক চন্দ্রের মতে, চা চাষ করার জন্য বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। কারণ চা চাষের পদ্ধতি উত্তরাধিকার সূত্রেই তারা অর্জন করেছেন। তাছাড়া তেঁতুলিয়া থেকে ভারতের বিখ্যাত চা অঞ্চল দার্জেলিং এর দূরত্ব মাত্র কয়েক কিলোমিটার আর সীমান্ত ঘেষেই গড়ে উঠেছে বড় বড় ভারতীয় চা বাগান। তাই তিনি মনে করেন, সঠিক নিয়মে যত্ন নিতে পারলে এই প্রকল্পে ঝুঁকি খুব কম। তবে মানব সৃষ্ট ঝুঁকি যে একেবারেই নেই তাও নয়। প্রসেসিং ফ্যাক্টরিগুলো কৃষকদের কাছ থেকে চা কিনে নিলেও প্রায় প্রতিদিনই দর উঠানামা করে। কেজি প্রতি চায়ের দাম স্থিতিশীল না থাকায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুক্ষিণ হতে হয় নিম্ন ও মাঝারি শ্রেণির কৃষকদের। পঞ্চগড় যেহেতু সমতল অঞ্চল তাই চা বাগানে যাতে পানি জমে না থাকে সে জন্য অসংখ্য সরু নালা কেটে বাগানের জমি প্রস্তুত করতে হয়। সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলের চায়ের সাথে পঞ্চগড়ের চায়ের স্বাদ ও পাতা সংগ্রহ প্রক্রিয়াতেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সিলেটের বাগান থেকে কচি পাতা সংগ্রহ করা হয় হাত দিয়ে আর পঞ্চগড়ে তুলনামূলক পরিপক্ক পাতা সংগ্রহ করা হয় দা কিংবা কাচি দিয়ে কেটে। একটু বেশি লাভের আশায় এখানকার চা চাষীরা এরকম করেন। মানিক চন্দ্র জানালেন, হাতে সংগ্রহ করলে যে সময়ে ১৫শ কেজি পাতা পাওয়া যায়, দা দিয়ে কেটে ঐ সময়ে পাওয়া যায় প্রায় ৪ হাজার কেজি। তবে কচি পাতার চা-ই স্বাদ ও মানে বেশি ভালো।

বুরো বাংলাদেশের সাথে মানিক চন্দ্রের সংযোগ স্কুল শিক্ষিকা বড় দিদির মাধ্যমে বছর দু'য়েক আগে। ঋণ নিয়েছিলেন দেড় লাখ টাকা যার পুরোটাই বিনিয়োগ করেছেন চায়ের বাগানে। প্রথম ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে, আবারও ঋণ নিয়ে আরো এক একর জমিতে চায়ের বাগান সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তিনি। একজন চা উদ্যোক্তা হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান মানিক চন্দ্র। বুরো বাংলাদেশ তার এই স্বপ্ন পূরণে সহযাত্রী হবে- তেমনটাই প্রত্যাশা করেন তিনি।■

● লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, প্রত্যয়

মাকে নিয়ে হজ্ব এবং আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা : শেষ পর্ব

আরিফ আজম সিন্টু

২০০৪ সালের ৯ জানুয়ারি সকাল ১০টা। আজ আমাদের মদিনাবাসের দ্বিতীয় দিন। নিয়ম অনুযায়ী হজ্বের সফরে প্রত্যেক হাজীকে কমপক্ষে ৮ দিন মদিনা অবস্থান করে মসজিদে নববীতে ৮ দিনে মোট ৮ X ৫ = ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হয়। এটা অবশ্য হজ্বের অংশ নয়। তবে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর একটি বিখ্যাত এবং প্রসিদ্ধ হাদিস মতে এটা করতে হয়। হাদিসটি হলো 'যে ব্যক্তি হজ্ব করলো, কিন্তু আমাকে দেখতে এলো না (অর্থাৎ আমার রওজা মোবারক জিয়ারত করলো না), তার হজ্ব বিশুদ্ধ হলো কি না, এটা একমাত্র মহান আল্লাহরই এখতিয়ার।' এই হাদিসের আলোকে সৌদি সরকার নিয়ম করেছে যে, হজ্বের আগে বা পরে প্রত্যেক বিদেশি হাজীকে কমপক্ষে ৮ দিন মদিনাবাস করে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ ও হুজুরের রওজা মোবারক জিয়ারত করতে হবে। সেই হিসাবে আমাদের আরো ৭ দিন মদিনা থাকতে হবে। অবশ্য মদিনা থাকাটাও একটা শান্তির ব্যাপার। পাঠক, বেয়াদপি ধরবেন না। মক্কার তুলনায় মদিনা শহর অনেক শান্তির, মনোরম এবং সুন্দর গোছানো শহর। আবহাওয়া চমৎকার এবং প্রকৃতিও অনেক সুন্দর। মনে হয়, মদিনা মরুভূমির মধ্যে একটি সুন্দর মরুদ্যান আর মক্কা শহর অনেকটা অনুর্বর এবং ধু ধু বালুময় মরুভূমি। বড় বড় পাহাড় এবং পাথরে ভর্তি। মদিনার চারপাশেও পাহাড়, তবে মক্কার মত এত উঁচু ও কর্কশ নয়। যারা এই দুই শহরেই থেকেছেন, আশা করি তারা দুই শহরের পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন।

যা হোক, আমি দুই শহরের তুলনায় যাবো না। পরবর্তী ৭ দিন আমি আমার মাকে নিয়ে কিভাবে মদিনা শহরে কাটিয়েছি সে বর্ণনা দেবার চেষ্টা করছি। ২য় দিন সকালে ফজর নামাজ যথারীতি মাকে নিয়ে মসজিদে নববীতে আদায় করেছি। হোটেলে ফিরে বাঙালি হোটেল থেকে সকালের নাস্তা কিনে হোটেলে বসে মার সাথে খেয়েছি। মা বয়স্কা মানুষ। আগের ২ দিনের দীর্ঘ সময়ের সফরের ধকলে উনি বেশ ক্লান্ত এবং নাস্তা করেই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু আমি তখনো ৫০ বছরের এক টগবগে যুবক! হোটেলে বসে থাকার ধৈর্য আমার নেই। মাকে বলে শহরটা ঘুরতে বের হলাম। প্রথমে হেঁটেই গেলাম পাশে অবস্থিত মদিনা পাবলিক লাইব্রেরিতে। আমার আরেকটা অভ্যাস হলো, যে শহরেই সফরে যাই না কেন, সে শহরটা পায়ে হেঁটে যতটুকু সম্ভব ঘুরে ফিরে দেখি এবং বাকিটা বাসে করে। এবং যে শহরেই যাই না কেন ঐ শহরের ৩টি জায়গায় আমি অবশ্যই যাবো। ১. ঐ শহরের পাবলিক লাইব্রেরি, ২. মিউজিয়াম (যদি থাকে) এবং ৩. চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেন।

সেই অভ্যাস মতো প্রথমে গেলাম পাবলিক লাইব্রেরিতে এবং পরের ৭ দিন প্রত্যেকদিন ১ বার করে ওখানে গিয়েছি এবং বইপত্র পড়েছি। লাইব্রেরিতে অধিকাংশই আরবী ভাষার বই, তবে অল্প সংখ্যক ইংরেজি বইও আছে। সৌদি আরবের ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি (বাদশা নীতি), জীবনধারা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য সব বিষয়েই ইংরেজি ভাষায় বই আছে, তবে ওখানে বসে পড়তে হয়। হোটেলে আনা যায় না। সে কারণে ওখানে বসেই পড়তে হয়েছে। মদিনা জাদুঘরকে ধর্মীয় জাদুঘরই বলা যায়। ভাস্কর্য জাতীয় কোনো কিছুই নেই। তবে সেই ঐতিহাসিক আমল থেকেই অর্থাৎ প্রাক ইসলামিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত রক্ষিত বস্তুই আছে। পাঠকবর্গ, অনেকেই হয়তো জানেন, মদিনা শহর প্রিয় নবীজীর (সা.) নানার বাড়ি। নবীজী (সা.) এর মা হযরত আমিনার জন্মভূমি এবং বাবার বাড়ি। আমাদের কাছে নানার বাড়ি যে রকম মজার ও আনন্দের, সে কারণেই হয়তো মদিনা শহর সৌদি আরবের সবচে মজার এবং মনোরম শান্তির শহর। অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছে এবং স্থানীয় বসবাসকারী এবং কর্মরত বাংলাদেশি ভাইদের সাথে আলাপ করায় তারাও আমাকে সমর্থন করেছেন।

মদিনা শহরের আশপাশে কয়েকটি ধর্মীয় দ্রষ্টব্য স্থান আছে। পরবর্তী ৭ দিন আমি আমার মাকে নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে ওগুলো দেখেছি। এর মধ্যে প্রথমটি হলো বিখ্যাত ওহুদ যুদ্ধের প্রান্তর। যেখানে নবীজী (সা.) আপন চাচা বীর যোদ্ধা হযরত হামজা (রা.) সহ শহীদ ৭০ জন মুসলিম যোদ্ধার কবর আছে। মাকে নিয়ে গেলাম মসজিদে কেবলা তাইবে। যে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় নবীজী (রা.) ওহী পেয়ে তক্ষুনি মসজিদে আকসার দিক থেকে ঘুরে পবিত্র মক্কা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ শেষ করেন। সেই থেকে সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের কেবলা হয়ে যায় পবিত্র কাবা শরীফ এবং কিয়ামততক এটি কেবলা হিসেবেই থাকবে।

এবার আসবো আরেকটি ভিন্ন প্রসঙ্গে। পাঠকগণ, ইতোপূর্বে জেনেছেন, জনৈক ঢাকাইয়া কুট্টির হজ্বের ঘটনা। এবার বলবো এক ভারতীয় (অসমীয়া) মুসলমান পীরের হজ্বপর্ব। উনি ভারতের আসাম রাজ্যে বসবাসরত এক বাঙালি পীর। মানে, উনার দাদার আমল থেকেই উনারা বাংলাদেশ থেকে (মির্জাপুর, টাঙ্গাইল) হিজরত করে আসাম চলে গেছেন ব্যবসার কারণে। ব্রিটিশ আমলে এরকম অনেকেই করতো। ঐ পীর সাহেবের বাবা এবং উনার জন্ম, বড় হওয়া এবং স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়া ভারতের আসাম প্রদেশের ধুবুড়িয়া শহরে। তার সাথে আমার পরিচয় মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার সময়। মাঝে মাঝে আসরের নামাজের পরে আমি মসজিদে এসে তসবীহ্ তেলাওয়াত করতাম। তখন প্রায় প্রত্যেক দিনই ঐ পীর সাহেবকে আসরের নামাজের পর ওনার সাথে থাকা ৪০/৫০ জন ভারতীয় হাজীর মাঝখানে উঁচু চেয়ারে বসে বয়ান করতে শুনতাম। বাংলাদেশের মত এই প্রথাটা দেখলাম মসজিদে নববীতেও আছে। নামাজ শেষে দেশীয় গ্রুপ করে বসে বিভিন্ন দেশের হাজীরা তাদের স্বীয় পীরদের (মালয়েশিয়া, ভারত, তুর্কী, ইরানী, ইন্দোনেশিয়া এমনকি আমেরিকান হাজীদেরও দেখলাম এরকম গ্রুপে) কাছে ধর্মের বয়ান শুনেন। ভারতীয়-অসমিয়া পীর সাহেবটি অসমিয়া ভাষায় এবং মাঝে মাঝে বাংলা ভাষাতেও বয়ান করতেন। বাংলা ভাষা শুনে আমার আগ্রহ জাগলো এবং একদিন বয়ান শেষে ঐ পীর সাহেবকে সালাম দিয়ে প্রশ্ন করলাম আপনি কি বাঙালি নাকি আসামী। উনি আমার কথা শুনে হাসলেন এবং বললেন, বসেন আমার পাশে। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম এটা উনার ১২তম হজ্ব। প্রতিবারই বদলী হজ্বের উদ্দেশে উনি হজ্বে আসেন এবং সাথে সাথে ৪০/৫০ জন হাজীর বিরাট এক বহর, যারা উনার হজ্বের যাবতীয় খরচ এবং যার যার সামর্থমতো নজরানাও দিয়ে থাকেন। উনি তা সানন্দে স্বীকার করলেন, এটাও উনার একপ্রকার বাৎসরিক ব্যবসা। অবশ্য দেশে (আসামে) উনার অন্যান্য ব্যবসাও আছে। কথা শেষে উনাকে সালাম দিয়ে উঠে গেলাম এবং ভাবলাম, দেশে দেশে কত মানুষের কত বিচিত্র রকম ব্যবসা! ধর্মীয় ব্যবসা ইসলামে জায়েজ কিনা এ প্রশ্ন অবশ্য পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম না, বেয়াদবী হয় কিনা এই ভেবে।

মসজিদে নববীর একজন সম্মানীয় ইমাম সাহেবের কথা এখানে না বললেই নয়। ঐ ইমাম সাহেবটি প্রতিদিন ফজর নামাজ পড়তেন। মসজিদে নববীতে পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচ জন ইমাম সাহেব নামাজ পড়াতেন। উনাদের সাথে আমার পরিচয় হয়নি তবে গলার সুর ও সুরা তেলাওয়াতের বৈশিষ্ট্য শুনেই চেনা যেতো ঐ পাঁচ সম্মানিত ইমাম সাহেবেকে। সকালে ফজর নামাজ যিনি পড়াতেন, তিনি প্রত্যেকদিনই অতি সুললিত কণ্ঠে সুরা আর রাহমান পড়তেন। এতো সুন্দর সুললিত ও দরদমাখা কণ্ঠে তিনি সুরাটি পড়তেন যে মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুনতেন এবং মনে হতো যেন মহান পবিত্র আল্লাহ ওনার মুখ দিয়ে উনার সমস্ত নেয়ামত পৃথিবীতে ঢেলে দিচ্ছেন। এতো সুন্দর আবৃত্তির জন্য সারা পৃথিবীতে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল (নামটি আমি এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না)। তিনি ২০২০ সালে ইন্তেকাল করেছেন এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তার মৃত্যু সংবাদ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়েছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। আমি নিজেও শুনেছি বিবিসি, সিএনএন, আল জাজিরা এমনকী বাংলাদেশ টিভিতেও। সার্থক তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু– আল্লাহ তাকে বেহেশত নসীব করুন (আমিন)।

এবারও শেষ করবো আমার মদিনা জীবনের আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা দিয়ে। আমি শেষ দিন অর্থাৎ মদিনাবাসের ৭ম দিনের মাগরেব নামাজ অন্তে মসজিদের ভিতরেই এক দেয়ালে হেলান দিয়ে তসবীহ পড়ছি। তেমন সময় হঠাৎ করে আমার নজরে পড়ল মসজিদের সর্বোচ্চ মিনারটির দিকে। দেখলাম ৪০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মিনারের সর্ব উঁচু প্রকোষ্ঠে সাদা পাঞ্জাবী ও টুপি পরিহিত ১৫/২০ জন হাজী নবীজির রওজা মোবারকের দিকে হাত উঁচু করে দোয়া পড়ছেন। এ দৃশ্য দেখে আমার মনে উদ্রেক হলো, আমিও উনাদের সাথে শরীক হই। এই উদ্দেশে আর দেরি না করে তক্ষুনি পাশের ঐ উচ্চ মিনারের দোরগোড়ায় গিয়ে একমাত্র লিফটে করে ঐ মিনারের সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে উঠে গেলাম ৪/৫ মিনিটের মধ্যে। কিন্তু গিয়ে দেখি, প্রকোষ্ঠটি একেবারেই খালি, কেউ নেই সেখানে একমাত্র প্রথমদিনের সেই স্বর্গীয় সুগন্ধি ছাড়া। ব্যাপারটা এবার আমি বুঝতে পারলাম। শরীরটি কাটা দিয়ে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঐ লিফটে করেই নিচে নেমে এলাম। পরে ঐ অসময়ি পীর সাহেবকে ব্যাপারটি খুলে বললে উনি বললেন, 'উনারা ছিল একদল ফেরেশতা। প্রতি ওয়াক্ত নামাজ শেষে এক এক দল ফেরেশতা নবীজীর (স.) রওজা মোবারক জিয়ারত করেন। হাজীদের কারো চোখে ব্যাপারটি ধরা পড়ে, কারো চোখে ধরা পড়ে না। মনে পড়লো আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনের সুরা নং ৩৩ : সুরা আহযাব : আয়াত নং ৫৬। সেখানে লেখা আছে 'আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন। অতএব হে বিশ্বাসীগণ, তোমরাও নবীর প্রতি রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করো (দরুদ পড়) এবং তার প্রদর্শিত পথে নিজেকে সমর্পিত কর।'

আধুনিক পাঠকবর্গ ব্যাপারটি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। কিন্তু ব্যাপারটি সত্য। কোরআন শরীফের প্রতিটি আয়াত সত্য এবং অলঙ্ঘনীয় এবং অপরিবর্তনশীল। মুসলমান হিসেবে প্রতিটি মুসলমানকেই এটা বিশ্বাস করতে হবে এবং কোরআন শরীফের প্রতিটি আয়াতকে বিশ্বাস করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ধর্মীয় কোনো গোড়ামী নয়, বরং অবশ্য কর্তব্য এবং পালনীয় বিষয়।■

● লেখক : প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, অ্যাসিস্ট্যান্স ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেন (এবিসি), ঢাকা

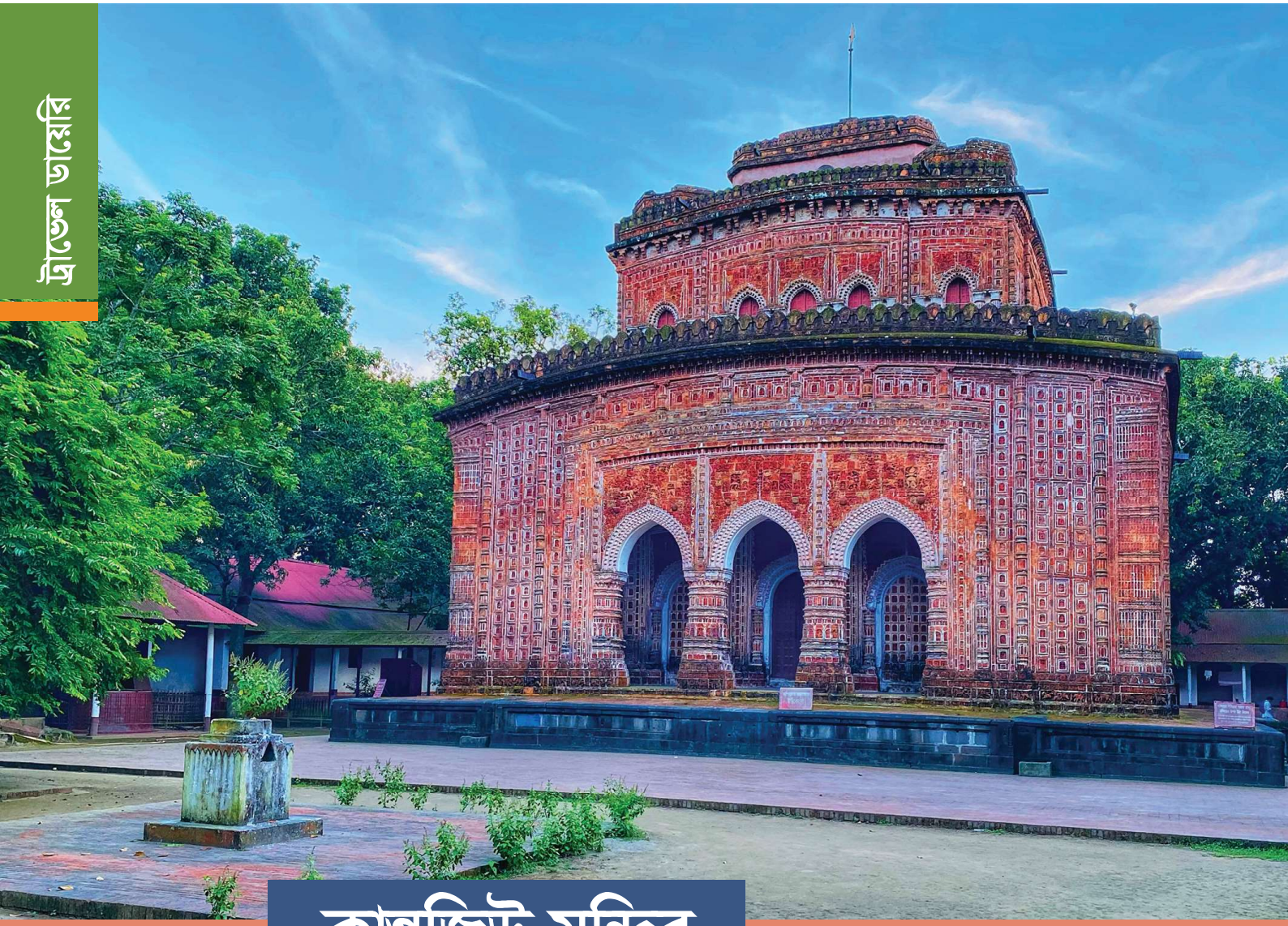

কান্তজিউ মন্দির

দিনাজপুর

যেতে যেতে প্রায় সূর্যাস্ত। আশঙ্কা ছিলো, আঁধারে হয়তো পর্যটন হবে, কিন্তু সাথের ক্যামেরাটা কোনো কাজে আসবে না। তবে শেষ পর্যন্ত যাত্রা পুরোপুরি বিফলে যায়নি। দিনাজপুর শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে কাহারোল উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের কান্তনগরে আমরা যখন পৌঁছলাম তখনও পশ্চিম আকাশে বেশ অনেকটা আলো আমাদের জন্য অবশিষ্ট ছিলো। সেই মৃদু আলোতেই আমাদের পর্যটন হলো, হলো ফটোগ্রাফিও। এ যেন আলোর সাথে প্রতিযোগিতা। অবস্থাটা এমন– আগে ছবি তুলি, মন্দির পরে দেখবো।

এখানে যে নদী আছে সেটার নাম ঢেপা। ঢেপা অর্থ আমার জানা নেই। এই ঢেপা নদীর তীরেই বিখ্যাত কান্তজিউ মন্দির। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম কালিয়াকান্তের সূত্রেই বাংলাদেশের সুন্দরতম এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। 'সুন্দরতম' বিশেষণটি আমার নয়, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ বুকানন হ্যামিলটনের। এই মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বছরের ৯ মাস অধিষ্ঠিত থাকে, আর বাকি তিন মাস থাকে কুষ্টিয়ায়। কথিত আছে, এই কান্তনগরে ছিলো মহাভারতের রাজা বিরাটের গো-শালা।

বর্গাকার ত্রিতল রথের আকৃতিতে কান্তজিউ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন দিনাজপুরের জমিদার মহারাজা প্রাণনাথ রায়। এটা ১৭০৪ সালের কথা। ১৭২২ এ মহারাজার মৃত্যু হলে তার পালিত পুত্র রামনাথ রায় সে কাজ শেষ করেন ১৭৫২ সালে। মূল মন্দিরের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট আর উচ্চতা ৭০ ফুট। বিশাল এই মন্দিরটি ৬০ ফুট বাহু বিশিষ্ট বর্গাকার একটি বেদী বা মঞ্চের উপর নির্মিত হয়েছে। শোনা যায়, এ বেদীর পাথরগুলো আনা হয়েছিলো প্রাচীন বানগড় নগরের বিভিন্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলো থেকে। কান্তজিউ মন্দিরের আরেক নাম নবরত্ন মন্দির, কারণ এর প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় চারটি করে আটটি এবং তৃতীয় তলায় একটি স্তম্ভসহ মোট নয়টি স্তম্ভ বা চূড়া ছিলো। বর্তমান ছবি দেখে এ চূড়াগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে সবগুলো চূড়াই বিধ্বস্ত হয় যা পরে আর সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। একই কারণে উচ্চতা নিয়েও বিরোধ রয়েছে। যাই হোক, পুরো মন্দিরে রামায়ন-মহাভারতের প্রায় সবকটি প্রধান কাহিনী এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সম্রাট আকবরের কিছু চিত্রকর্ম এতো বিপুল সংখ্যক টেরাকোটা দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে যা এক কথায় অতুলনীয়। এই লাল টেরাকোটাগুলোই মূলত মন্দিরের মূল ঐশ্বর্য। বাংলার ঐতিহ্য কান্তজিউ মন্দির ১৯৬০ সাল থেকে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষণে রয়েছে।

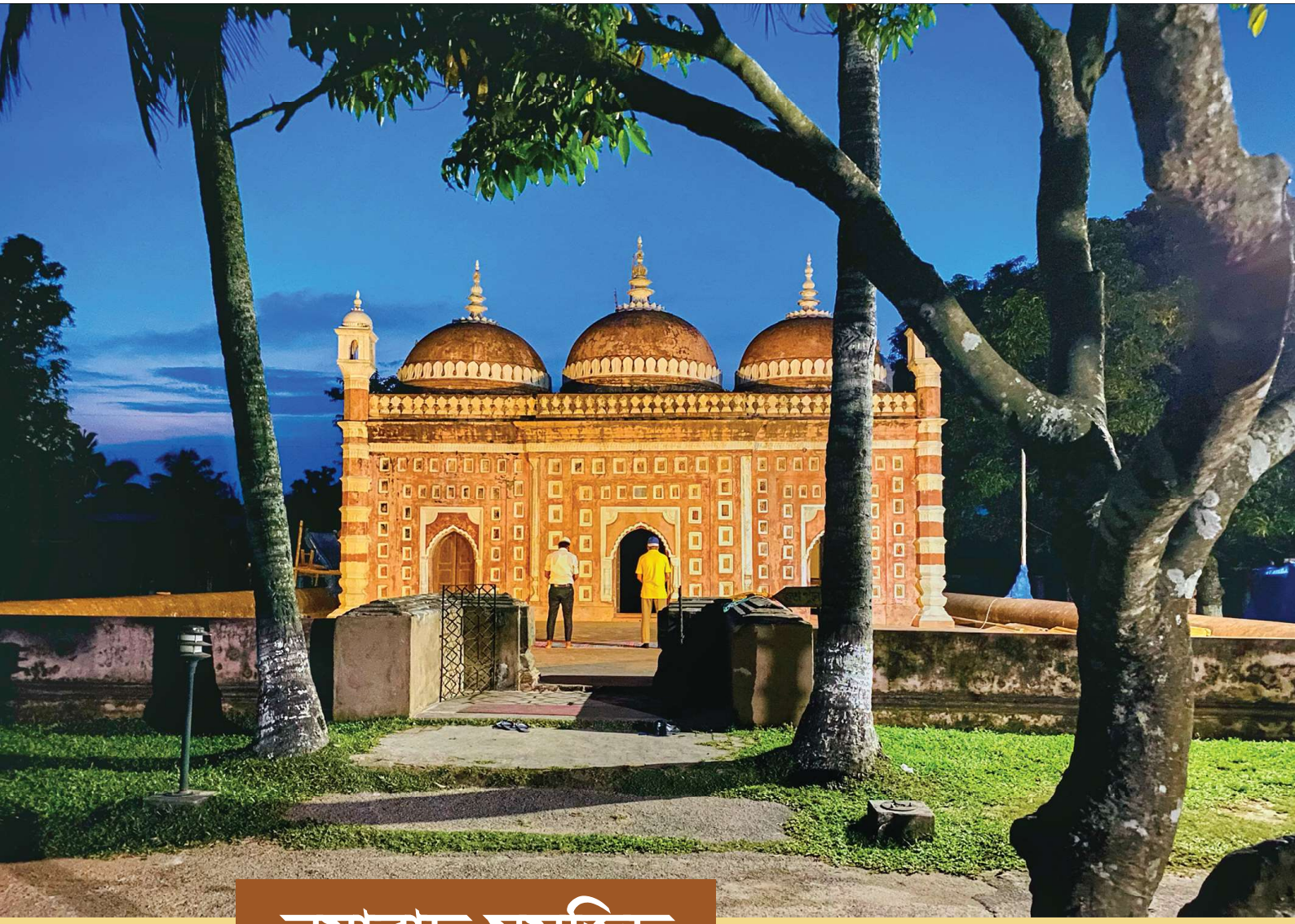

নয়াবাদ মসজিদ

দিনাজপুর

কান্তজিউ মন্দির দেখে আমরা ছুটে চললাম এক কিলোমিটার দূরে কান্তনগরের আরেক ঐতিহাসিক স্থাপত্য নয়াবাদ মসজিদ দেখার উদ্দেশ্যে। ততক্ষণে মাগরিব শুরু হয়ে গেছে, তিন দিক অন্ধকার হলেও পশ্চিমে কিছুটা নীল তখনও লেগে আছে। এই মসজিদের কথা আগে জানাই ছিলো না, জানালেন মন্দিরের এক পুরোহিত। পুরোহিত যখন বললেন, নয়াবাদ মসজিদটিও মহারাজা প্রাণনাথের দেয়া জমি ও অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে তখন বিস্মিত হয়েছি। বিস্মিত হলেও এটাই বাংলার প্রকৃত সংস্কৃতি। অন্ধকারে যখন আমাদের গাড়ি ছুটছে তখন হতাশ হচ্ছিলাম এই ভেবে যে মসজিদটির ছবি বোধহয় আর নেয়া হলো না। কিন্তু আমার মোবাইলের ক্যামেরা আর মসজিদ প্রাঙ্গণের তীব্র আলোর বৈদ্যুতিক বাতি সেই হতাশাকে স্থায়ী হতে দেয়নি।

নয়াবাদ মূলত কাহারোল উপজেলার একটি গ্রাম। কান্তজিউ মন্দির নির্মাণ করার জন্য হিন্দু কারিগরদের পাশাপাশি মহারাজ প্রাণনাথ বিপুল সংখ্যক বিদেশী মুসলিম মিস্ত্রি বা কারিগর নিয়ে এসেছিলেন। কেউ কেউ বলেন তারা ছিলেন মিশরীয়, কেউ বলেন পারসিক। মূলত তাদের অনুরোধেই রাজা প্রাণনাথ নয়াবাদে জমি বরাদ্দ করেন এবং সেখানেই প্রায় ৪৮ বছর ধরে এই মসজিদ নির্মিত হয়। এই বিদেশী মুসলিম মিস্ত্রিদের অনেকে স্বদেশে ফিরে গেলেও বাংলার মাটিতেই থিতু হন কেউ কেউ। ফলে নয়াবাদের এই এলাকাটির নাম হয়ে উঠে 'মিস্ত্রিপাড়া'। থেকে যাওয়া মিস্ত্রিদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন 'নিয়াজ' বা নেওয়াজ মিস্ত্রি। তার ধ্বংসপ্রায় কবরটি এখনও মসজিদ প্রাঙ্গণে রয়ে গেছে। স্থানীয়দের ধারনা, মিস্ত্রিপাড়ার সব অধিবাসীই সেই নেওয়াজ মিস্ত্রির বংশধর।

মুঘল স্থাপত্য শৈলিতে নির্মিত নয়াবাদ মসজিদটি খুব একটা বড় নয়। দৈর্ঘ্যে ১২.৪৫ মিটার আর প্রস্থে ৫.৫ মিটার। ভেতরে দুই কাতারে একসাথে ৪০ জন আর বাইরে খোলা প্রাঙ্গণ মিলে ১০০ জন একত্রে নামাজ আদায় করতে পারেন। মসজিদে প্রবেশের জন্য তিনটি খিলানযুক্ত দরজা আর উত্তর-দক্ষিণে দুটি বড় জানালা আছে। অন্যান্য মুঘল মসজিদের মতো এই মসজিদেও তিনটি মেহরাব আছে। নয়াবাদ মসজিদটিও দৃষ্টিনন্দন টেরাকোটায় আচ্ছাদিত। নানা ধরনের ফুল আর লতাপাতার টেরাকোটা যে কাউকে মুগ্ধ করবে। ২০১৭ সালের সংস্কার কাজ মসজিদটির স্থায়ীত্ব যেমন বৃদ্ধি করেছে তেমনি মসজিদ কমপ্লেক্সটিও হয়েছে সুপরিসর ও পর্যটক বান্ধব। কান্তনগরের এই ঐতিহাসিক মসজিদটিও সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষণে রয়েছে।■

● লেখা ও ছবি
নির্বাহী সম্পাদক, প্রত্যয়

নতুন জীবনে শিলা বেগম

মো. হামিদুল ইসলাম

স্বপ্ন

বলছি টাঙ্গাইল জেলায় নাগরপুর উপজেলার রাথুরা গ্রামের খন্দকার ইলিয়াস হোসেনের মেয়ে শিলা বেগমের স্বপ্নের কথা। রাথুরা গ্রামে প্রায় তিন হাজার পাঁচশত মানুষের মধ্যে শিলার বসবাস। এক সময় রাথুরা গ্রামে জমিদারদের বসবাস ছিলো। রাথুরা একটি প্রাচীন ঐহিত্যবাহী গ্রাম। শিলা বেগমের বয়স যখন ৯ বছর তখন মারা যায় তার বাবা। সেটা ১৯৯০ সালের কথা, অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে কঠিন এক সংগ্রামের মধ্যে বড় হতে হয় শিলা বেগমকে। সে স্বপ্ন দেখেছিল লেখাপড়া করে বড় হবে। কিন্তু বাবার মৃত্যুতে শিলা বেগম তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেনি। অনেক সময় দু'মুঠো ভাতের সন্ধানে পিতৃহীন শিলা বেগমকে ছুটতে হতো অন্যের বাড়িতে। মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, শিলা বেগমও তার ব্যতিক্রম নয়। একটি উক্তি আছে 'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়'। তাই শিলা বেগমের স্বপ্ন থেমে নেই। শিলা স্বপ্ন দেখে নিজে স্বাবলম্বি হয়ে নিজের স্বপ্ন পূরণ করবে। অল্প বয়সে স্বামী হারিয়ে শিলার মা তিন সন্তান নিয়ে অনেকটাই দিশেহারা। খুব কষ্ট করেই ভূমিহীন বিনা বেগম তার তিন সন্তানকে মানুষ করতে লাগলো। শিলা তিন ভাইবোনের মধ্যে বড়। শিলার বয়স যখন ১৬ বছর, মা সিদ্ধান্ত নিল শিলার বিয়ে দিবে, গ্রামের মানুষের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে পাশের গ্রামের ফল ব্যবসায়ী খন্দকার দিপুর সাথে শিলার বিয়ে হয়। স্বামীর সংসারে শিলা নতুন করে তার অপূরণীয় স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন তার সন্তানদের তিনি লেখাপড়া করিয়ে মানুষের মত মানুষ করবেন। এরই মধ্যে শিলার গর্ভে নতুন অতিথির আগমন– তাকে ঘিরে শিলার হাজারও স্বপ্ন।

স্বপ্নভঙ্গ

শিলার স্বামী ছিল মৌসুমী ফল ব্যবসায়ী। শিলার বিয়ের পর প্রথম সাত বছর তার ব্যবসা ভালোই চলছে। দিপু ব্যবসার পাশাপাশি মাঝে মাঝে অন্যের জমিতে কাজ করতো। এরই মধ্যে শিলার গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে তার লালিত স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশায় শিলা। বেশ সুখেই চলছে শিলার সংসার। দিপু সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যবসা ছেড়ে বিদেশ যাবেন। ঢাকাতে এক দালালের কাছে টাকা পয়সা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দিপুর বিদেশ যাওয়ার সুযোগ হলো না। সবকিছু হারিয়ে দিপু অনেকটাই পাগল প্রায়। শুরু হলো তাদের স্বপ্নভঙ্গ, বড় ছেলেকে লেখাপড়া বাদ দিয়ে হোটেলে কাজ করতে দেয় এবং দিপু নিজে যমুনার চরে অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালাতে শুরু করে। অভাব-অনটনে প্রতিদিন শিলার সংসারে অশান্তি লেগেই আছে। শিলা ইতোমধ্যে দ্বিতীয় সন্তানের মা। দুই সন্তানকে নিয়ে নিরুপায় জীবন সংগ্রামের মধ্যে পড়েন শিলা। তিল তিল করে গড়ে ওঠা স্বপ্নগুলো ভেঙে তছনছ হতে শুরু করল শিলার।

নতুন জীবনে শিলা

সহজ, সাবলীল আর মুখভর্তি হাসি নিয়ে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেন তিনি আগামীর সম্ভবনার স্বপ্ন পূরণে। ছোট বেলা থেকেই গড়ে ওঠা স্বপ্নগুলোকে কোনো ক্রমেই মাটি চাপা দিতে রাজি নয় শিলা। শুরু হলো তার সংগ্রামী জীবন, সিদ্ধান্ত নিলেন সংসারের বাড়তি রোজগারের জন্য কিছু একটা করবেন।

অবশেষে শুরু করলেন যমুনার চরে অন্যের জমিতে চিনা বাদাম উঠানোর কাজ ও বিকেলে

পাকুটিয়া বাজারে পিঠা বানিয়ে বিক্রি করা। সেখান থেকেই তাদের সংসারে কিছুটা বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থা হল। এভাবে বেশ ভালোই চলছে শিলার সংসার। এরই মধ্যে স্বামীর হঠাৎ জটিল অসুখে নেমে এলো তাদের সংসারে অন্ধকারের ছায়া। একদিকে স্বামীর অসুখ অন্যদিকে শিলার একক আয় সব মিলে এ যেন এক জীবন যুদ্ধের মধ্যে নিমজ্জিত হলেন শিলা, কিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। এরই মধ্যে তার পিঠার ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে, বিকেলে দূর-দূরান্ত থেকে অনেকেই আসতো শিলা আপার পিঠা খেতে। কিন্তু পিঠার ব্যবসার পাশাপাশি অন্য একটি ব্যবসা করবে তেমন সামর্থ্য ছিল না শিলার।

হঠাৎ আলোকবর্তিকা হয়ে ধরা দেয় বুরো বাংলাদেশ। পরিচয় হয় পাকুটিয়া শাখার লোন অফিসার লিপি আক্তারের সাথে। তার সাথে প্রাথমিক আলোচনায় শিলা বুরো বাংলাদেশ থেকে কিভাবে লোন নিতে হয় এবং কিভাবে লোন পরিশোধ করতে হয় সে সম্পর্কে অবগত হলেন। পরের সপ্তাহে পাশের প্রতিবেশী ছবি ভাবির মাধ্যমে পাকুটিয়া শাখার ৫৬ নম্বর কেন্দ্রের ৬৭১৪ নম্বর সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে সঞ্চয় ও ডিপিএস চালানোর কিছুদিন পর শিলা পিঠার ব্যবসার পাশাপাশি তার স্বামীর হারানো ব্যবসা ফিরে পাওয়ার জন্য বুরো বাংলাদেশের লোন অফিসারের নিকট দশ হাজার টাকার ঋণ প্রস্তাব করলেন। শাখার ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজার প্রস্তাব যাচাই সাপেক্ষে শিলার দশ হাজার টাকা ঋণ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ঋণ গ্রহণের পরের সপ্তাহ থেকেই শিলা নিয়মিত কিস্তি প্রদান করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করলেন। এদিকে বুরো বাংলাদেশের দশ হাজার টাকা দিয়েছেন, পিঠার ব্যবসার পাশাপাশি মৌসুমী ফলের ব্যবসা জমে উঠেছে, এবার সহযাত্রী তার স্বামী। স্বামী যখন ৪৪ শিলা তখন ৪০ বছরে পা রেখেছেন। এই বয়সে শিলা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন। ইতোমধ্যে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে মাধ্যমিকের গণ্ডি পার করিয়ে ছেলেকে এককভাবে একটি মুদি দোকান করে দিলেন। দুয়ে মিলে শিলার এখন সুখের সংসার। শিলা এখন স্বাবলম্বী। শিলার বর্তমানে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ঋণ চলমান রেখে ৬৬৭ টাকা সঞ্চয় ও ৪৭০০ টাকা ডিপিএস জমা করেছেন।

শিলার বাড়িতে ছিল না নিরাপদ পানি খাওয়ার ব্যবস্থা। বেশ কয়েক বাড়ি দূর থেকে তাকে খাবারের জন্য নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে হতো। এটি যেমন কষ্টকর তেমনি অন্যের দ্বারস্থ হওয়াটাও অসম্মানের। তার পরিবারের ধোয়া-মোছাসহ অন্যান্য কাজের জন্য পাশের একটি পুকুরের পানি ব্যবহার করতেন, যার ফলে প্রতিনিয়ত অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত। শিলা একদিন পাকুটিয়া শাখায় নিরাপদ পানি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত থেকে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হলেন। শিলা উদ্যমী মনোভাব, একাগ্রতা এবং সচেতনতাকে কাজে লাগিয়ে পুনরায় বিশ হাজার টাকার নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ঋণ গ্রহণ করে নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে করেছেন নিরাপদ পানির সংস্থান। এখন তিনি বুরো বাংলাদেশের এমন মহতী কাজের কথা তার প্রতিবেশিসহ আত্মীয় স্বজনদের সাথে আলোচনা করেন। তার আঙিনায় নিরাপদ পানির সংস্থান করার ফলে শিলার পরিবার পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্তি পেল এবং এ ধরনের একটি ঋণ গ্রহণ করে শিলার অনেক দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবে পূরণ হলো।

শূন্য হাতে দারিদ্র্যের সাথে আজন্ম লড়াই করা শিলা বেগমের মুখে কেবলই আত্মপ্রত্যয়ের হাসি, যে হাসি একদিন ছিলো মরিচিকার মতো আজ তা প্রকাশিত, উন্মুক্ত। শিলা বেগম বলেন, আমার মতো নারীরা কাজ করে যাতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে এজন্য থাকতে হবে আত্মপ্রত্যয়। আমি একদিন থাকবো না, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে নিরাপদ পানি পান করে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে এটাই আমার প্রত্যাশা। তাই তো স্বপ্নের সারথী বুরো বাংলাদেশের প্রতি মস্তকাবনত চিত্তে অকপটে উজাড় করে জানান দিলেন সমস্ত ভালবাসার কথা– এক যুদ্ধজয়ী বীরাঙ্গনার মতো।■

● ট্রেইনার– হেলথ এন্ড হাইজিন
(ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্প)
বুরো বাংলাদেশ, টাঙ্গাইল বিভাগ।

বুরো বাংলাদেশের বৈদেশিক রেমিটেন্স সেবা ও বাংলাদেশের অর্থনীতি

এসএমএ রকিব

যখনই দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধির কথা আসে, তখন একবাক্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিটেন্সের কথা আগে বলতে হবে যা দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান সোপান। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য বৈদেশিক সম্পদ অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হলো রেমিটেন্স। বুরো বাংলাদেশ ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের নতুন প্রজন্মের বেসরকারি ব্যাংক 'ব্যাংক এশিয়া লি.' এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এর মাধ্যমে রেমিটেন্স সেবার সূচনা করে।

রেমিটেন্স বলতে সহজ অর্থে আমরা বুঝি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ। আর অর্ন্তমুখী বৈদেশিক রেমিটেন্স বলতে বুঝায় দেশের বাইরে থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈধভাবে প্রেরিত অর্থ। সাধারণভাবে আমরা রেমিটেন্স বলতে বুঝি, দেশের বাইরে অবস্থানরত অভিবাসীদের প্রেরিত কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা যা তাদের স্বজনদের নিকট পাঠানো হয়। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বা রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশী অভিবাসীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে দেশের বার্ষিক রেমিটেন্সের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে।

সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ১ কেটির বেশি মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাবিধ পেশায় জড়িত রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে তাদের নিকটজনের নিকট অর্থ পাঠাচ্ছে। গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২৪,৭৭৭ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ ২,১০১ বিলিয়ন টাকা দেশে এসেছে। বাংলাদেশ সরকার তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈধ পথে প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার গত জুলাই ২০১৯ থেকে বৈধ পথে রেমিটেন্সকে উৎসাহিত করার জন্য ২% হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান করছে, এর ফলে করোনাকালেও বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠালে দেশের অর্থনীতির জন্য শুধু ক্ষতিই নয় তা দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা তথা নিরাপত্তার জন্য হুমকি, কারণ অবৈধ আয়ের লেনদেনের কোন রেকর্ড না থাকায় তা সন্ত্রাসী অথবা রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতায় ব্যবহৃত হতে পারে।

১৯৭৪ সালে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ বৈধ মাধ্যমে দেশে নিয়ে আসার জন্য মজুরী উপার্জনকারী প্রকল্প বা ওয়েজ আর্নার্স স্কিম শুরু করা হয়েছিল। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের মধ্যে দ্রুতই এই প্রকল্প জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১১.৮ মিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স প্রেরণ করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সনে বৈদেশিক কর্মসংস্থান শুরু হয় এবং সে বছর ৬০৭৮ জন বাংলাদেশি বিদেশে গমন করেন। ১৯৮০-৮১ অর্থ বছরে যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে তা ৭৫০ মিলিয়ন ডলার

ছড়িয়ে যায়। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের অর্জিত আয় সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রেরণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে স্কিমটি চালু করা হয়। এ সময় বৈদেশিক মুদ্রা মজুত থাকার কারণে আমদানিকারকদের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রার ছাড় হ্রাস পায়, যার ফলে স্কিমটি কার্যকারিতা অর্জন করে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমজীবীদের প্রেরিত অর্থ খোলাবাজারে বিনিময় হারের কাছাকাছি হারে বিনিময়ের লক্ষ্যে স্কিমটি চালু করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতার কারণে আমদানিকারকরা সরকারি হার অপেক্ষা উচ্চ হারে সেকেন্ডারি মার্কেট হিসেবে গড়ে উঠা ওয়েজ আর্নার্স মার্কেট থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে থাকে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। মানব সম্পদ রপ্তানি থেকে অর্জিত আয় হিসেবে পরিগণিত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ চলতি হিসাবে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী উৎসে পরিণত হয়।

প্রারম্ভিক বছর ১৯৭৪-৭৫ সালে বিদেশ থেকে প্রবাসীদের প্রেরিত মোট অর্থ ছিল ১১.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ খাতে অর্জিত অর্থের পরিমাণ ১৯৮০-৮১ সালে ৩৭৮.৭৪ মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৯০-৯১ সালে ৭৬৪ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। ১৯৯৮-৯৯ বছর শেষে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৭ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ শ্রমিক রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বে অন্যতম প্রধান দেশ। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে নতুন চাকরির সুবিধা প্রসারিত হওয়ায় প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ধারা সূচিত হয়।

যখনই দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধির কথা আসে, তখন একবাক্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিটেন্সের কথা আগে বলতে হবে যা দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান সোপান। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য বৈদেশিক সম্পদ অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হলো রেমিটেন্স। আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রবাসে কর্মরত হাজারো ভাই-বোনেরা। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা সর্বদাই ইতিবাচক। রেমিটেন্স হলো দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি এবং উন্নয়নের ভিত্তি ও অন্যতম চালিকাশক্তি।

রেমিটেন্স সেবায় বুরো বাংলাদেশ

ইতিপূর্বে শুধুমাত্র তফসিলি বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে বৈদেশিক রেমিটেন্স কার্যক্রম করতে পারতো। এখানে উল্লেখ্য যে, সংস্থা তিন দশক ধরে সুনামের সাথে বিস্তৃত পরিসরে জনমানুষের সাথে প্রত্যেক সম্পৃক্ততা বজায় রেখে সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দেশের অর্থনীতির গতিকে সচল ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে সংস্থা ২০০৭ সাল থেকে রেমিটেন্স সেবা চালু করে। কারণ দেশের অধিকাংশ রেমিটেন্স গ্রাহকরা প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করেন কিন্তু ব্যাংকসমূহের শাখা শহরে বিস্তৃত হওয়ায় অর্ন্তভূক্তিমূলক অর্থায়ন কর্মসুচির আওতায় ব্যাংকিং সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৭ সাল থেকে এনজিও-এমএফআই এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রদানের জন্য অনুমতি দেয়। এ ক্ষেত্রে এনজিও-এমএফআইসমূহ কোন তফসিলি ব্যাংকের সাব এজেন্ট হিসাবে তাদের শাখার মাধ্যমে প্রবাসী পরিবারদেরকে রেমিটেন্স সেবা প্রদান করতে পারবে।

বুরো বাংলাদেশ ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের নতুন প্রজন্মের বেসরকারি ব্যাংক 'ব্যাংক এশিয়া লি.' এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এর মাধ্যমে রেমিটেন্স সেবার সূচনা করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো রেমিটেন্সের অর্থ দেশব্যাপী বুরোর শাখাসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের সকল নির্দেশাবলী অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট গ্রহণকারীর কাছে নিরাপদে ও দ্রুত পৌঁছে দেয়া হয়।

সংস্থার সাথে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের রেমিটেন্স কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য চুক্তি রয়েছে। বর্তমানে সংস্থা ৪টি ব্যাংক- ব্যাংক এশিয়া, এবি ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক এবং দি সিটি ব্যাংক এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে আসা বৈদেশিক রেমিটেন্স সুনির্দিষ্ট গ্রাহকদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে। এ পর্যন্ত সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ১৫ লক্ষ পরিবারকে প্রায় ৪,৫০০ কোটি টাকার রেমিটেন্স সেবা দেয়া হয়েছে। সরকার গত জুলাই ২০১৯ থেকে বৈধ পথে রেমিটেন্সকে উৎসাহিত করার জন্য ২% হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান করছে। বুরো বাংলাদেশ নগদ প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যংকের সকল নির্দেশাবলী ও সার্কুলার অনুসরণ করে এ পর্যন্ত ২,৫৮,৮৯২ জন গ্রাহকের মাঝে ১৮,২৫,৩১,৪৫৩ টাকা বিতরণ করেছে ।

রেমিটেন্স বাংলাদেশের ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জনগণের জীবিকায়নে বড় ভূমিকা পালন করে আসছে। রেমিটেন্স আয় বাংলাদেশের মতো কোনো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অতি মূল্যবান কারণ অভিবাসী শ্রমিকদের আয়ের বড় অংশ দেশে তাদের স্বজনদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। রেমিটেন্স দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথা যে সমস্ত ক্ষেত্রে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নিচে উল্লেখ করা হল:

- রেমিটেন্স আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ফলে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।
- সরকার রেমিটেন্স আয় থেকে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি আমদানি বিল এবং বিভিন্ন বিদেশী ঋণ ও অনুদানের বিনিয়োগ মিটিয়ে থাকে।
- রেমিটেন্স আয় বাংলাদেশ সরকারকে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নিভরশীলতা কমাতে সাহায্য করে।
- বাংলাদেশ সরকার রেমিটেন্স আয় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, সেতু ও মহাসড়ক ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহার করে থাকে।
- রেমিটেন্স প্রবাসীদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়।
- রেমিটেন্স বাংলাদেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট (বিওপি) ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- রেমিটেন্স আয় মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি মুদ্রায় শক্ত অবস্থান নিশ্চিত করে।

বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা থেকে পাওয়া উন্নয়ন সহায়তার চেয়ে রেমিটেন্সের ভূমিকা ও গুরুত্ব অনেক বেশি এবং বেসরকারি ঋণ সংস্থান ও পোর্টফোলিও ইক্যুইটি প্রবাহের চেয়েও অনেক বেশি স্থিতিশীল। অর্থনৈতিক উন্নয়নে জিডিপিতে রেমিটেন্সের অবদান প্রায় ৭ শতাংশের মতো। তাই প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রবাসী এসব শ্রমিক যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছেন, তা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের অর্ধেক। বিগত চল্লিশ বছরে প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ প্রবাসী বিদেশে গমন করেছেন এবং তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজেদের কষ্টার্জিত উপার্জনের অর্থ নিয়মিত পাঠিয়ে তারা এ দেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গড়ে যাচ্ছেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৬৪২ কোটি ডলার এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৮২০ কোটি ডলার বা ১৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স দেশে পাঠিয়েছেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স আহরণ। তৈরি পোশাকের পরে অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থান যা দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে রাখতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। প্রবাসীদের

কারণে এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণে আছে এবং যার পরিমাণ জুন ২০২১ শেষে ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অবদান এতটাই শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ যে, ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা যখন পুরো বিশ্বকে চোখ রাঙিয়েছে, তখন বাংলাদেশের জন্য বর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল এসব প্রবাসী, বাঁচিয়েছিল এ দেশের মানুষ ও এর অর্থনীতির চাকাকে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংকটের মধ্যেও দেশ রেমিটেন্স আহরণে রেকর্ড করেছে।

করোনার প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান স্থবিরতার মধ্যেও এক দিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি সূচকে রেকর্ড হয়েছে। আমদানিতে বড় ধসের বিপরীতে রেমিটেন্সে বড় উল্লম্ফন এবং রফতানি খাত ঘুরে দাঁড়ানোকেই রিজার্ভ বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা। প্রবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি এবং ঐ বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকার কাজ করছে।

রেমিটেন্সের ভূমিকা ও গুরুত্ব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানাবিধ এবং নানামুখী। প্রবাসীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা বড় অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের নিকট পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে রেমিটেন্স এভাবে গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে। জাতীয় অর্থনীতির তাই অন্যতম চালিকাশক্তি এই রেমিটেন্স। রেমিটেন্সের উপর ভর করেই এখন আমরা পদ্মা সেতুসহ অনেক বড় বড় প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করার সাহস পাচ্ছি। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের জন্য আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। আমরা এতদিন সহজ শর্তে ছোট ছোট ঋণ নিতাম, এখন আমরা বড় ঋণ নেয়ার সাহস অর্জন করছি।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে বলে অনেকে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রেমিটেন্স একই সাথে দেশের বেকার সমস্যা নিরসনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া জনশক্তি রফতানির ফলে বিরাট সংখ্যক জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা ও খাদ্যসামগ্রীও স্থানীয়ভাবে জোগাড় করতে হচ্ছে না। সারা বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় সোয়া কোটি বাংলাদেশি, যারা সার্বিকভাবে আমাদের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছেন।

দেশের অর্থনীতিতে রেমিটেন্সের গুরুত্ব অনুধাবন করে তা বাড়াতে সরকারি উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। যেমন- প্রবাসী আয় প্রেরণে ব্যয় হ্রাস, বিদেশে কর্মরত ব্যাংকের শাখা ও এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোকে রেমিটেন্স প্রেরণে দক্ষ করে তোলা। আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই জনশক্তি রফতানি নিশ্চিত বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত। শুধু নিশ্চিত বিনিয়োগই নয়, নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবেও জনশক্তি রফতানিকে বিবেচনা করা যায়। রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে জনশক্তি রফতানির যেমন প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি বিদেশে কর্মরত জনশক্তির পারিশ্রমিক যাতে কাজ ও দক্ষতা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, সে জন্যও সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, জনশক্তি রফতানির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার যদি কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে, তা হলে জনশক্তি রফতানির সুফল ও রেমিটেন্স প্রবাহ আমাদের অর্থনীতির ইতিবাচক খাতের সঙ্গে একই ধারায় প্রবাহিত হবে। বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি খাতে রেমিটেন্স আয় আরো বাড়ানোর জন্য হুন্ডি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি।

জনশক্তি রফতানি খাতটি এখনো বলতে গেলে পুরোপুরি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এতে বিদেশ গমনকারীদের যেমন বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে তেমনি প্রতারিত হতে হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে বিদেশে জনশক্তি রফতানি করা গেলে এ সমস্যা অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব হতো। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থায় জনশক্তি রফতানি খাত ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে এক মহীরুহ। কিন্তু এ খাতের সম্ভাবনাকে এখনো পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অর্থ উপার্জন যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে সেই অর্থের উৎপাদনমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা। পরিকল্পিতভাবে জনশক্তি রফতানি খাতের সমস্যা সমাধান এবং পেশাজীবী ও দক্ষ জনশক্তি বিদেশে প্রেরণের পাশাপাশি তাদের পাঠানো অর্থ সঠিকভাবে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা গেলে এ খাত দেশের অর্থনৈতিক চিত্র পাল্টে দিতে পারে।■

● লেখক: সহকারী সমন্বয়কারী
বিশেষ কর্মসূচি, বুরো বাংলাদেশ

জাতীয় শোক দিবসে বিশেষ আলোচনা সভা

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে গত ১৭ আগস্ট একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন ও বাঙালি জাতির জন্য তার স্বপ্ন ও আত্মত্যাগের কথা আলোচনা করা হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এ দেশের মাটি ও মানুষের নেতা। দেশের মানুষকে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে তিনি দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলন করেছেন, জীবনের একটি বড় সময় কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাঁকে ফাঁসি দেয়ার আয়োজন করেছিল– কিন্তু তিনি দেশের স্বাধীনতা ও মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ছিলেন অটল। তিনি কখনো নতজানু হননি। তিনি বলেন, এই মহান নেতার জন্ম না হলে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হতো না। প্রধান অতিথি বলেন, এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়ন কর্মে অংশ নিতে হবে।

আলোচনা সভার আগে অতিথিবৃন্দ পৃথক মতবিনিময় সভায় অংশ গ্রহণ করেন। এই সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর চেয়ারম্যান ও সাবেক সিনিয়র সচিব মো. আবদুস সামাদ।

একই সাথে জাতীয় শোক দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে বুরো বাংলাদেশ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় কোরআনখানী ও দোয়ামাহফিলের আয়োজন এবং দেশব্যাপী ১০৬২টি শাখা এবং প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ প্রদান

৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রণোদনা ঋণ প্রদান অনুষ্ঠান ঢাকার গুলশান-২ এ বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে করোনাকালে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বুরো বাংলাদেশের ৩৬ জন গ্রাহককে ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. কেএম তারিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জাকির হোসেন, প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ; এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক-অর্থ; মো. সিরাজুল ইসলাম- পরিচালক বিশেষ কর্মসূচি এবং ফারমিনা হোসেন পরিচালক- অপারেশনস ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চল। অনুষ্ঠানে বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণোদনা ঋণ প্রদান অনুষ্ঠান ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বুরো বাংলাদেশের ১২ জন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহককে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ৮ লক্ষ টাকা প্রণোদনা ঋণ প্রদান করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. খলিলুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব), ঢাকা বিভাগ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ.কে.এম. মাসুদুজ্জামান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), ঢাকা বিভাগ এবং জনাব মো. শহিদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, ঢাকা। সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চল, বুরো বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট এলাকা ও শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ।

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকার জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠান। এদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রণোদনা ঋণের ১২ লক্ষ টাকা বুরো বাংলাদেশের ২০ জন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক- ঢাকা জেলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোছাঃ নাজমা নাহার- অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত- আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চল, বুরো বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকা ও শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ।

বুরো বাংলাদেশ ও কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন

টাঙ্গাইলে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি মোকাবেলায় বুরো বাংলাদেশ এককভাবে এবং বিভিন্ন ব্যাংকের অর্থায়নে সহযোগী হিসেবে দেশব্যাপী খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে টাঙ্গাইলের ১২টি উপজেলার সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও টাঙ্গাইল সদরে অবস্থিত ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামাগ্রী প্রদান করা হয়েছে। প্রদানকৃত সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: রেফ্রিজারেটর, জেনারেটর, ইসিজি ম্যাশিন, সিরিঞ্জ পাম্প, ডিজিটাল ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, পাল্‌স অক্সিমিটার, অক্সিজেন ফ্লো মিটার, কেএন-৯৫ মাস্ক, ফেস শিল্ড ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার।

অনুষ্ঠানে কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন এর ১০ লক্ষ টাকা অর্থায়নে ১০টি উপজেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। একই অনুষ্ঠানে বুরো বাংলাদেশের একক অর্থায়নে ১৫ লক্ষ টাকার সমমূল্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল এবং টাঙ্গাইল সদর ও মধুপুর উপজেলার সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন– জনাব সিরাজুল হক আলমগীর, মেয়র, টাঙ্গাইল পৌরসভা, টাঙ্গাইল। প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ আলী খান, পরিচালক, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, টাঙ্গাইল। ডা. আবুল ফজল মো. সাহাবুদ্দিন খান, সিভিল সার্জন, টাঙ্গাইল। ডা. খন্দকার সাদিকুর রহমান, সহকারী পরিচালক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল।

কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলনের পক্ষ থেকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন– সাকির খসরু, এজিএম ও হেড অব পার্সনাল ব্যাংকিং এবং সদস্য, ম্যানেজমেন্ট কমিটি । মিস উরমি ইরানি খান, ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিপজিট মোবিলাইজেশন এবং সদস্য, সিএসআর কমিটি মির্জা সাইফুর রহমান, রিলেশনশিপ ম্যানেজার, কর্পোরেট ব্যাংকিং।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন– রাহেলা জাকির, পরিচালক, বুরো ক্রাফট ও গভর্নিং বডি সদস্য, বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশন, টাঙ্গাইল।

বুরো বাংলাদেশের
ঐতিহাসিক ভার্চুয়াল কর্মীসভা

৩০ অক্টোবর ২০২১ বুরো বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। এদিন বিকেল ৩টায় সংস্থার প্রায় ১০ হাজার কর্মীকে ZOOM এর মাধ্যমে যুক্ত করে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভার্চুয়াল বার্ষিক কর্মী সভা। দেশব্যাপী ৯৪০টি ভেন্যু থেকে ৯৪৩টি ডিভাইসের মাধ্যমে এ সভায় যুক্ত হয়েছিলেন বুরো বাংলাদেশের সর্বস্তরের কর্মীবৃন্দ। এক সাথে প্রতিষ্ঠানের সব কর্মীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ ধরনের সভা এটাই প্রথম।

ঢাকার গুলশানের প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচালিত সর্ববৃহৎ এই ভার্চুয়াল কর্মী সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। বক্তব্য রাখেন পরিচালক- অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচি মো. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক, ফারমিনা হোসেন, পরিচালক- অপারেশনস ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং পরিচালক বুরো ক্রাফট ও হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশন- রাহেলা জাকির। আলোচনায় আরো অংশগ্রহণ করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং মাঠ পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নির্বাচিত কর্মী। আলোচনায় অংশ নিয়ে সংস্থার কর্মীবৃন্দ তাদের বিভিন্ন প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন এবং সংস্থার কর্মসূচি বাস্তবায়নে আরো জোরালোভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সাড়ে তিন ঘন্টা ঐতিহাসিক এ ভার্চুয়াল সভায় যারা বক্তব্য রেখেছিলেন তারা হচ্ছেন: বিভাগীয় ব্যবস্থাপক- শাহীনুর ইসলাম খান, সাইদুর রহমান রিপন; আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক- রিয়াজ উদ্দিন, আল আমীন খান, টুটুল চন্দ্র পাল, মোতাহারুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত, উত্তম কুমার বসাক; এলাকা ব্যবস্থাপক- মাহবুব আলম, ইকবাল হায়দার, আক্তারুজ্জামান; শাখা ব্যবস্থাপক- আব্দুল কাদের, বখতিয়ার খিলজি, বিজয় কুমার সুত্রধর, শফিউল ইসলাম, রায়হান মাহমুদ; শাখা হিসাবরক্ষক- আশরাফুন্নাহার, মাসুদ করিম, নাজমা বেগম, মনিরা খাতুন, সাজেদা আক্তার, এসএম জহিরুল ইসলাম, আশিক ইসরাক; ঊর্ধ্বতন কর্মসূচী সংগঠক- নাছিমা আক্তার, শাহিনা আক্তার, রাজিউল ইসলাম, তাসলিমা খাতুন, মিঠুন সরকার, রিয়াদ হাসান, অপু রঞ্জন আচার্য্য; কর্মসূচী সংগঠক- রোমান হোসেন, বাবলু রহমান, হারুন অর রশিদ, মিরাজুল মোল্লা, জুনাইদ মিয়া এবং সহকারী কর্মসূচী সংগঠক- মাসুদ রানা।

বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনকে বিকাশ এর অনুদান

দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বুরো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাত 'বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশন'কে ১০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে বিকাশ।

বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশ গ্রামীণ ও দরিদ্র মানুষের জন্য স্বল্প মূল্যে উন্নতমানের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে। বিকাশের অনুদানের এ অর্থ বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করা হবে।

গত ১০ নভেম্বর ২০২১, গুলশানে অবস্থিত বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচি মো. সিরাজুল ইসলাম ও বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনের পরিচালক রাহেলা জাকিরের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুদানের চেক তুলে দেন বিকাশের চিফ এক্সটার্নাল অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মেজর জেনারেল শেখ মো. মনিরুল ইসলাম (অব.)। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের পরিচালক- অপারেশনস ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফারমিনা হোসেন এবং বিকাশের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার আলী আহম্মেদ।

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) বুরো বাংলাদেশ সারা দেশে প্রায় ১৯ লক্ষ সদস্যের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে, যাদের অধিকাংশই নারী জনগোষ্ঠী। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ ও প্রদানের পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশের সদস্যরা তাদের সঞ্চয় স্কিমের কিস্তির টাকা বিকাশের মাধ্যমেই জমা দিতে পারছেন। বুরো বাংলাদেশ দেশব্যাপী তাদের ১০৬২টি শাখায় ঋণ ও সঞ্চয়ের কিস্তির টাকা বিকাশের মাধ্যমে গ্রহণ করে।

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার অর্থায়নে ও বুরো বাংলাদেশের সহযোগিতায় লালমনিরহাট জেলার সদর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সমগ্রি বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট জেলার জেলা প্রশাসক মো. আবু জাফর, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া'র বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর ও সিইও সুমন্ত ঘোষ, হেড অব ক্রেডিট দিপঙ্কর বড়ুয়া, লালমনিরহাট সদর পৌরসভার মেয়র মো. রাশেদুল হক প্রধান, বুরো বাংলাদেশের অর্থ ও হিসাব বিভাগের সমন্বয়কারী আব্দুল হালিম, বিভাগীর ব্যবস্থাপক- রংপুর মো. আব্দুস সালাম ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক বাহাদুর আলমসহ সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ।

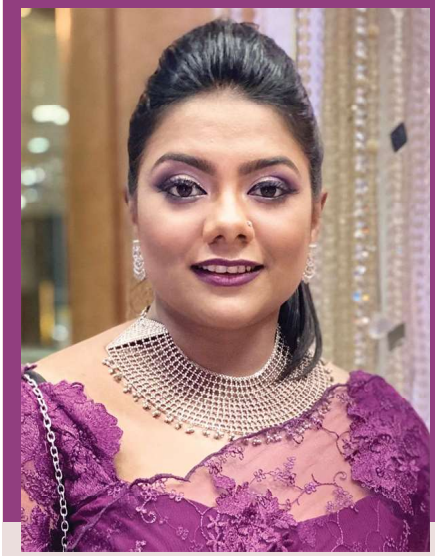

অভিনন্দন

বুরো বাংলাদেশের অতিরিক্ত পরিচালক- অপারেশনস ফারমিনা হোসেন পদোন্নতি পেয়ে 'পরিচালক- অপারেশনস ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস' হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বুরো বাংলাদেশ পরিবারের পক্ষ থেকে ফারমিনা হোসেনকে প্রাণঢালা অভিনন্দন।

একই সাথে তিনি সংস্থার প্রশিক্ষণ বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনও অব্যাহত রেখেছেন।

ফারমিনা হোসেন যুক্তরাজ্যের University of Birmingham থেকে International Development বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর ২০১৬ সালে Young Professional হিসেবে বুরো বাংলাদেশে যোগদানের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি Brac University থেকে Operations Management and HR বিষয়ে EMBA ডিগ্রি লাভ করেন।

ফুট স্টেপসকে বুরো'র অনুদান

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ফুট স্টেপস বাংলাদেশকে আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে বুরো বাংলাদেশ। এই অনুদানের মাধ্যমে সংস্থাটি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুরে ২০০টি পরিবারের মাঝে ফার্স্ট এইড মেডিকেল বক্স হস্তান্তর করেছে। মেডিকেল বক্স হস্তান্তরের আগে সংস্থাটি প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের বক্সের উপকরণগুলো ব্যবহার সম্পর্কীত প্রশিক্ষণও প্রদান করে।

প্রত্যয় সম্পাদক কবি ফেরদৌস সালাম এর টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদ পুরস্কার ২০২১ প্রাপ্তি

টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদ পুরস্কার ২০২১ লাভ করেছেন প্রত্যয় সম্পাদক কবি ফেরদৌস সালাম। টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান খান ফারুক এর নিকট থেকে তিনি এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। গত ৮ অক্টোবর ২০২১ টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদ আয়োজিত সাধারণ গ্রন্থাগার মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক ড. মো. আতাউল গনি এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহাম্মদ নূরুল হুদা।

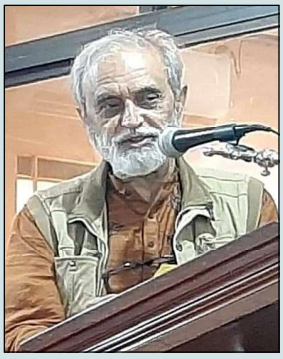

কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা

ড. মো. আতাউল গনি

উদ্বোধনী ভাষণে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান খান ফারুক বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সূতিকাগার টাঙ্গাইলে শুধু বরেণ্য রাজনীতিবিদদেরই জন্ম হয়নি– অনেক গুণী কবি সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বেরও এটি চারণভূমি। তিনি কবি সাহিত্যিকদের লেখায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা বলেন, টাঙ্গাইল হচ্ছে কবিতার রাজধানী। টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদের এই উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, কবিরা সবসময় সত্য উচ্চারণ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. মো. আতাউল গনি বলেন, যে কোনো সমাজের কবি-সাহিত্যিকরা হচ্ছেন অগ্রসর চিন্তার মানুষ। তারা সত্য ও সুন্দরের লক্ষ্যে হৃদয়ের আকুতিকে তুলে ধরেন শব্দের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, আমি সত্যিই আনন্দিত বোধ করি যে, সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে টাঙ্গাইল অনেক এগিয়ে। যে সমাজে সাংস্কৃতিক চর্চা প্রাধান্য পায় সেখানে অনিয়ম অনাচার অনেক কম হয়।

তিনি আরো বলেন, একটি উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদের সভাপতি কবি মাহমুদ কামাল। কবিতায় সাহিত্য সংসদ ২০২১ এর ভাষা সৈনিক শামসুল হক পুরস্কার পান কবি ফেরদৌস সালাম ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোমিনুর রহমান। তরুণ লেখক পুরস্কার পেয়েছেন নাট্যকার তৌফিক আহমেদ, শিশু সাহিত্যিক কাশীনাথ মজুমদার পিংকু, প্রাবন্ধিক আলী রেজা এবং কথাসাহিত্যিক রুদ্র মোস্তফা।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ভাসানী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার নাজিম উদ্দিন, টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব এর সভাপতি জাফর আহমেদ, শামসুল হক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. সাইফুল ইসলাম স্বপন, টাঙ্গাইল সাহিত্য পরিষদের উপদেষ্টা জাকিয়া পারভীন, টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদ এর উপদেষ্টা ডা. রতন চন্দ্র সাহা ও ছায়ানীড়, টাঙ্গাইল এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক লুৎফর রহমান।

১০৮ বছর বয়সে গারো পুরোহিত এর মৃত্যু

টাঙ্গাইলের মধুপুর বনাঞ্চলের চুনিয়া গ্রামের বর্ষীয়াণ গারো পুরোহিত জনিক নকরেক চিরবিদায় নিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৮ বছর। আদিবাসী গারোদের প্রায় সবাই পৈতৃক আদিধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি আমৃত্যু আদিধর্ম 'সাংসারেক' রীতিকেই আঁকড়ে ছিলেন। জনিকের জন্ম ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর। মামার বাড়ি ছিল মধুপুরের পীরগাছা গ্রামে। কৈশোরে মামার বাড়ি বেড়াতে এসে ওয়ানগালা বা নবান্ন অনুষ্ঠানে নাচগানের সময় চুনিয়া গ্রামের সুন্দরী তন্বী অনিতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর গারোদের প্রথা অনুযায়ী চুনিয়া গ্রামের শ্বশুর বাড়িতেই তিনি আমৃত্যু বাস করেন।

নকরেক এর মৃত্যুতে বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ও এফএনবি চেয়ার জাকির হোসেন তাঁর আত্মার শান্তি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, আদিবাসী গারো জনসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। এদের সবাই খ্রিস্টান। সাংসারেক বা আদি গারো ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মাত্র ৪৭ জন। জনিক নকরেক ছিলেন তাদের পুরোহিত।

জোসপিনা পান্না। ওঁরাও জাতির এক কর্মঠ নারীর প্রতিচ্ছবি। থাকেন ঠাকুরগাঁ সদরের আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ভাতগাঁও গ্রামে। এ গ্রামে বসবাস করেন গোটা বিশেক ওঁরাও পরিবার। ওঁরাওরা আগে দিনমজুর ছিলেন, তারও আগে ছিলেন শিকারি। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা যেমন বিশাল সিন্ধু গড়ে তোলে, তেমনি দিন বদলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াস তাদের জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছে। ওঁরাওরা এখন আর ইঁদুর-পাখি শিকারি নয়, চাল-টাকা'র বিনিময়ে দিনমজুরও নয়। কেউ গবাদি পশু পালেন, কেউ পালেন হাঁস-মুরগি। আর সবজি চাষটা একেবারে সাধারণ বিষয় কারণ তাদের জমি আছে। জোসপিনারা দলবদ্ধভাবে তাঁতের কাজ করেন। এ তাঁত পাপোশ তৈরির। এই পাপোশই বদলে দিয়েছে ওঁরাওদের। শিকারি-দিনমজুররা হয়ে উঠেছেন নিপুন বুনন শিল্পী। ওঁরাওদের এই সিন্ধুসম পরিবর্তনের পেছনে মূল কারিগর ঠাকুরগাঁও এর বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ESDO (ইকো সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)। জোসপিনার এই হাসি ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি ওঁরাও ঘরে এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার গভীরে।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ • সংখ্যা-২৬ • বর্ষ-৬

BURO Bangladesh

WHERE DIGITAL FINANCE MEETS MICROFINANCE

Microfinance to Macro Happiness

Providing Development Services to the Poor Since 1990

BURO Bangladesh